ধর্ম্মজীবন।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

প্রণীত ও প্রকাশিত।

৭৭।১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজন কাননে ফুল, কত ফুটে যায়।
তার রূপ তার গন্ধ, কে জানিতে পায়॥
নীরবে মানব কত, করিয়া যতন।
নারায়ণে আত্মদেহ, করে সমর্পণ॥
ভোগের লালসা নাই, যশের বাসনা।
কর্ম্মফলে দেহধরে, হৃদয়ে সাধনা॥
কে তারে চিনিতে পারে, সংসার কাননে।
তার গন্ধ কেবা পায়, বিনা আকিঞ্চনে॥

কলিকাতা, ৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেসে, এস, সি, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮৩৬।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মজীবনের প্রথম সংস্করণ একেবারে নিঃশেষিত হওয়ায় আত্মীয়গণের আগ্রহাতিশয়ে আমি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে প্রবৃত্ত হইলাম। বর্ত্তমান সংস্করণে কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাঁহারা কৃপা করিয়া পাঠ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা।
৭৭।১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট,
শকাব্দাঃ ১৮৩৬।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী।

উৎসর্গ পত্র।

একজন আদর্শ হিন্দুর ধর্ম্মজীবন এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। হিন্দু মাত্রেরই ইহা পঠনীয় বিবেচনা করি; সুতরাং হিন্দুর নামে ইহা উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী।

শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ধর্ম্ম-জীবন।

জীব, বৃক্ষ, লতা, ও গুল্মাদির যেমন বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা আছে, সেই মত প্রত্যেক জাতিরও বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা আছে। ভারতের আর্য্যজাতির এক্ষণে একান্ত বৃদ্ধাবস্থা। এ অবস্থায় এ জাতির ধর্ম্ম ভাবের প্রাবল্য এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। দেশান্তরের মনুষ্যজাতির কেবল মাত্র বৃদ্ধাবস্থায় সাধারণতঃ যেমন ধর্ম্মভাব প্রবল হইতে দেখা যায়, ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তানগণের বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য বহুপূর্ব্ব হইতে একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বহুযুগ পূর্ব্বে এই প্রাচীন জাতিতে আজন্মশুদ্ধ ও আজন্মধার্ম্মিক শাক্যসিংহ, কণাদ, গৌতম, কপিল, জৈমিনি, পতঞ্জলি, বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্য-গোস্বামী প্রভৃতি যোগিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে তীর্থক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে। এ দেশের কুমারীগণ সংস্কার বশতঃ বাল্যাবস্থা হইতে শিব পূজায় মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকে,

এ দেশের সধবাগণ স্বামীকে কেবলমাত্র ভালবাসে না, ভক্তি ও পূজা করে। এ দেশের বিধবাগণ সর্ব্বভোগত্যাগিনী দেবী বিশেষ। এ দেশের ব্রাহ্মণ-কুমারগণ একপ্রকার শৈশবে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সংযমপরায়ণ হয় ও পরে বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দেব দেবীর পূজায় মন ও প্রাণ সমর্পণ করে। এ বৃদ্ধ জাতির গৃহে গৃহে ধর্ম্মচর্চ্চা, গৃহে গৃহে সাধক। স্থতরাং আমাদের সর্ব্বদা আশা থাকিবে যে এ দেশে একান্ত ঈশ্বর-পরায়ণ মহাপুরুষগণের জন্ম নিরন্তর হইতে থাকিবে।

আমি যে জীবনের দুই একটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা কীদৃশ, তাহা তাঁহার সম্বন্ধীয় ঘটনা পাঠ করিয়া যিনি তাঁহাকে যেরূপ ভাবিবেন তিনি সেইরূপ। লোকের গুণ, স্বভাব ও শক্ত্যাদি ভেদে একই পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়। নিজের প্রকৃতিগত ভাব ও ক্ষমতা মানব সকল সময়ে নিজেই বুঝিতে পারে না; অপরেত এক মানবকে ভিন্নরূপে দেখিবেই। রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীব-দ্দশায় তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রুত হয়। এইরূপ গত

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল লব্ধনামা ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন ও এক্ষণে গতাসু হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গুণের কথা শুনিয়াছি। এমন কি সামান্য প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্যে পরে কা কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহা বুঝিতে পারিলে কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও অসংখ্য নৃপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আজীবন বিপক্ষতা করিতেন না ও সমরক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। তবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কতকগুলি গুণ আছে তাহা অধিকাংশ লোকের স্বীকৃত। যেমন রামমোহনের প্রতিভা, বঙ্কিমের উপন্যাস রচনা শক্তি, দ্বারকানাথের বিচার শক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরদুঃখকাতরতা, মধুসূদনের কল্পনা শক্তি, গুরুদাসের পবিত্রতা ইত্যাদি। সেই হিসাবে বিচার করিলে সরল প্রাণে বলিতে পারা যায় যে আমি যে ব্যক্তি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা এই

বিশেষ গুণ ছিল। অর্থাৎ তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, দান প্রভৃতি গুণরাশি থাকিলেও কোন না কোন ব্যক্তি তাঁহাতে এই সকল গুণের মধ্যে কোনটীর অভাব ছিল বলিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল তাহা অধিকাংশ পরিচিত লোকেই স্বীকার করিবেন।

১৭৫৪ শকাব্দে (১৮৩২ খৃষ্টাব্দে) আশ্বিনের ২৯ দিবসে জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পাঁড়ুয়া নগরের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে শিমুলগড় (হরিহরপুর) গ্রামে স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ঔরসে ও স্বর্গীয়া ঠাকুরাণী দাসী দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার নাম নবীনচন্দ্র। পার্ব্বতীচরণ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কাশীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। কাশীনাথ রাজা আদিশূরের আনীত কাশ্যপ গোত্রধারী দক্ষবংশ সম্ভূত। দক্ষের বা তৎপুত্র কৃষ্ণের বিস্তৃত বংশের তালিকা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন জ্ঞান করিলাম না। কৃষ্ণবংশীয় স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বোক্ত হরিহরপুর গ্রামে ভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়া বাস করেন। সেই-

হেতু তাঁহারই বংশ তালিকা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের পরিশিষ্টে দিলাম। কি সূত্রে ও ঘটনা চক্রে নারায়ণচন্দ্র উক্ত গ্রামে বাস করেন তাহা নিরূপণ করা যায় না। মহারাষ্ট্রিয় দস্যুগণের উৎপীড়নে মান ও প্রাণের ভয়ে পবিত্র বাসস্থান সেই সময় নিত্য পরিবর্ত্তন করিতে হইত। ধর্ম্ম ও শান্তি সংস্থাপক ও একান্ত প্রজাপালক ইংরাজ রাজত্বে পরম সুখে বাস করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি দারুণ অত্যাচার সহ্য করিয়া গিয়াছেন তাহা কল্পনায় আনা যায় না। নারায়ণচন্দ্র নিশ্চয়ই বিপদাপন্ন হইয়া কোন স্থান হইতে আসিয়া হরিহরপুরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। বংশ তালিকায় দৃষ্ট হইবে নারায়ণচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র হরানন্দ ও হরানন্দের পুত্র কাশীনাথ। নারায়ণের, রামচন্দ্রের ও হরানন্দের জীবনের বৃত্তান্ত কিছুমাত্র সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। কাশীনাথ সম্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি ইংরাজী পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন ও ঢাকায় তাৎকালিক প্রভিনসিয়াল (**Provincial**) আদালতে, চট্টগ্রামে, ও বাঙ্গালার অপরাপর স্থানে চাকরী করিতেন। চাকরীতে তাঁহার মাসিক

কি আয় ছিল তাহা নিশ্চয় বলা যায় না কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় যে বহুদিনে তিনি চারি সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ সন ১১৯৬ সালে (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা প্রদেশে সরকারি রাজস্বের দশসালা বন্দোবস্ত হয় ও ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ বন্দোবস্ত কায়েম মোকাম হয়। ইহার পর রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোরের বিখ্যাত স্বর্গীয় রাজা রামকান্ত রায় ও রাণী ভবানীর সেই সাধক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ রায় নূতন বন্দোবস্তানুসারে সরকারে যথাসময়ে রাজস্ব দাখিল করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহার অধিকাংশ বিষয় একে একে বিক্রয় হয় ও তাহার ভৃত্যবর্গ অল্প মূল্যে ক্রয় করে। কথিত আছে যে বিষয় বিক্রয়ের অর্থ যাহা কিছু পাইতেন রাজা রামকৃষ্ণ সমস্তই জয় কালীর পূজার্থ দিতেন। কাশীনাথ এই সময়ের কিয়দ্দিবস পরে অর্থাৎ ইং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজা মহোদয়ের নদীয়া জেলার অন্তর্গত সাহজিয়ান পরগণার মধ্যে ডিহি সসারপাড়া নামক তৌজি ন্যূনাধিক দশ সহস্র টাকায় ক্রয় করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট চারি সহস্র মাত্র টাকা ছিল। তিনি

অবশিষ্ট টাকার জন্য জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্গীয়া রাজেশ্বরী দেবীর নিকট কর্জ্জ করেন। রাজেশ্বরী কলিকাতার সহরতলি খিদিরপুরস্থ বিখ্যাত স্বর্গীয় দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের কনিষ্ঠা পত্নী। ঘোষাল মহাশয় যখন (**Mr Verelest**) সাহেব বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্ত্তা সেই সময় দুই বৎসরের জন্য (১৭৬৭ নাং ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে) উহার দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতাও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী জমী-দার ছিলেন। বন্দোবস্তি কর্ম্মে (**Settlement work**) ঘোষাল মহাশয়ের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার দূরদর্শিতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষ-গণ চমৎকৃত হইতেন। দেওয়ান মহোদয় সন ১১৮৬ সালে, (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) চারি পুত্র, চারি কন্যা, দুই পত্নী ও বিপুল ধন সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী স্বর্গীয়া তারিণী দেবী দুই পুত্র শ্রীহরিনারায়ণ ও শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ঘোষাল ও এক কন্যা আনন্দময়ী দেবীকে রাখিয়া সহমরণ করেন। কনিষ্ঠা রাজেশ্বরী দেবী দুই পুত্র রামনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণের অকাল মৃত্যুতে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলে তিনি তাঁহার

কনিষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথকে শিমুলগড় হইতে অনেক অনুরোধে আনাইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। কথিত আছে, কাশীনাথের পিতা স্বর্গীয় হরানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যা রাজেশ্বরী দেবীর, দেওয়ান মহাশয়ের সহিত বিবাহ হওয়ায় তিনি বংশের অব-মাননা জ্ঞান করেন ও তাঁহার পত্নীর মতানুসারে এ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই জন্য বহু দিবস তিনি পত্নী হস্তে অন্নগ্রহণ করেন নাই। হরানন্দ নিতান্ত আস্তিক পুরুষ ছিলেন। স্বগ্রামে স্থাপিত শিবমূর্ত্তি তিনি স্বয়ং পূজা করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে অন্নাহার করাইয়া পরে তিনি আহার করিতেন। সে অন্য কথা, ফলে কাশীনাথ জ্যেষ্ঠা সহোদরার বড় প্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। কাশীনাথ মনে করিলে ছয় হাজার টাকা সহোদরার নিকট দানপ্রার্থী হইয়া সহজেই লইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া ক্রীত বিষয়ের দশ আনা অংশ বিক্রয় করেন। বক্রী ছয় আনা কাশীনাথের বংশধরগণের হস্তে এখনও আছে। ধর্ম্মোপার্জ্জিত বিষয় ঐ বংশে

এখনও কতদিন থাকিবে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিই জানেন। কাশীনাথ স্বপ্নদত্ত হইয়া প্রপৈতামহিক বাসের গৃহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপরিবারগণকে বাসার্থ অর্পণ করিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে স্থাপিত এক মঠে বাসের সঙ্কল্প করেন। মঠে ৺ কালী দেবীর সিন্দূর লেপিত মূর্ত্তি বহুকালাবধি গ্রাম্য সাধারণের দ্বারা অর্চ্চিত হইত। কাশীনাথের উক্ত নদীয়া জেলার বিষয় প্রাপ্তির সময়েই স্বপ্ন হয় যে ঐ মঠে পাকা দালান ও তন্নিকটস্থ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তাঁহার বংশ বিস্তার হইবে। এই স্বপ্ন দর্শনের কিয়দ্দিবস পরেই অর্থাৎ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত মঠের সান্নিধ্যে কালী দেবীর দালান ও বাসের উপযোগী গৃহ প্রস্তুত করেন। কাশীনাথ অধিকাংশ সময়ে পুত্র পার্ব্বতীচরণের হস্তে নিজ বৈষয়িক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং গভর্ণমেণ্টের চাকরী ও বিধবা সহায়হীনা শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবীর বৈষয়িক তত্ত্বাবধান করিতেন। সহোদরার পক্ষাবলম্বন করিয়া কখন কখন কলিকাতার বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণের আর্থিক সহায়তায় তাঁহাকে স্বর্গীয় গোকুল ঘোষাল মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত স্বর্গীয় জয়নারায়ণ

ঘোষাল মহাশয়ের সহিত বিবাদ করিতে হইয়াছিল। কাশীনাথ যতই নিস্পৃহ ও স্বাধীনচেতা হউন না কেন একথা সত্য যে তিনি সহোদরার নিকট অনেক প্রকারে উপকৃত হইতেন। ইহাও সত্য, যে উপকার তিনি সহোদরার নিকট পাইয়াছিলেন তাহা দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়াছিলেন। সন ১২৩৭ সালে কাশীনাথ খিদিরপুরে সহোদরার ভবনে রোগাক্রান্ত হন ও একদিবসকাল গঙ্গার তীরে বাস করিয়া এক মাত্র পুত্র, ও একটী কন্যা, ও পত্নী শ্রীমতী ভগবতী দেবীকে রাখিয়া সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেন। পুত্র পার্ব্বতীচরণ মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। প্রভূত ব্যয়ে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করেন। এই শ্রাদ্ধে ঘোষাল পরিবারগণও সহায় হন। প্রসিদ্ধ আছে শিমুলগড়ে ও তাঁহার নিকটস্থ গ্রামে এরূপ মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ কেহ অদ্যাবধি করিতে পারেন নাই। ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পরেও এই শ্রাদ্ধের ব্যাপার পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট শ্রুত হইয়া এখনও জনসাধারণে গল্প করেন। বিধবা ভগবতী দেবী শিমুলগড় ত্যাগ করিয়া কাশীযাত্রা করেন ও সেই

তীর্থে দেহত্যাগ করেন।

পার্ব্বতীচরণ একজন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁহার বহু বন্ধু ছিল। তাৎকালিক প্রথানুসারে তাঁহার অনেকের সহিত সখ্য পাতান ছিল। তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহার ন্যায় উচ্চমনের মানুষ ছিলেন। শরণাগতকে রক্ষা করা তাঁহার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। কত লোকের কত উৎকট দায় হইতে তিনি যে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। এই শরণাগতের রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার আর এক মহৎ গুণ ছিল, তাহা অতিথি সেবা। ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান পার্ব্বতী-চরণের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পার্ব্বতী-চরণের গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইতে কেহ কখন দেখেন নাই। অতিথির প্রার্থনা পূরণ করিতে যাইয়া তাঁহাকে অনাহারে দিন কাটাইতে অনেকে দেখিয়া-ছেন। তাঁহার পত্নীও নিরাভরণা অন্নপূর্ণা ছিলেন। এই অতিথি সেবার গৌণ ফল যাহাই হউক কিন্তু এই অতিথি সেবায় ও পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক

সমস্ত সম্পত্তি ঋণদায়ে আবদ্ধ হইয়াছিল। ভগ্নহৃদয়ে ও ভগ্ন দেহে ন্যূনাধিক ৪২ বৎসর বয়সে সন ১২৪৪ সালের শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশীতে তাঁহার পিতার গঠিত পবিত্র ৺ কালীদেবীর দালানে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার গৃহে একটি কপর্দ্দকও সংস্থান ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় গোপালচন্দ্রের সে সময় ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম, কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় নবীনচন্দ্রের ৪ বৎসর বয়ঃক্রম ও কন্যা স্বর্গীয়া রাখাল দাসী দেবীর ৯ বৎসর বয়ঃক্রম। পার্ব্বতীচরণের মৃত দেহ ত্রিবেণীর শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার পত্নীর কেবলমাত্র সম্বল এক হস্তের একগাছি স্বর্ণের কঙ্কণ বন্ধক দিতে হইয়াছিল। ঠাকুরাণী দাসী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন। স্বামী সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন, কাজেই দারিদ্রক্লিষ্ট হইয়া তাঁহার দুই পুত্র ও কন্যাটীকে প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল।

ঠাকুরাণীদাসী শিমুলগড়ের একজন অসামান্য প্রতিভাশালী অধ্যাপকের কন্যা। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও নিপুণ কবি ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত রচনাগুলি

কালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা গুলির মধ্যে কিছু কিছু আছে। যে সময়ে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন সে সময় বাঙ্গালা ভাষার তাদৃশ উন্নতিসাধন হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কবিতা রচনার খ্যাতি স্বদেশে বিস্তার হইয়াছিল। নিকটস্থ গ্রামের অনেক লোক তাঁহার নিকট কবিতা ও গান লিখাইবার প্রার্থী হইয়া আসিত। সেই সময় অস্মদ্দেশে গানের এক যুগ ছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার রচিত ৺সত্য-নারায়ণের হস্তলিখিত ব্রতকথা ঘরে ঘরে পঠিত হইত। তাঁহার দৌহিত্র স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সন ১২৮৮ সালে সাধারণের সুবিধার জন্য উহা মুদ্রাঙ্কণ করেন। গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়। সমস্ত পুঁথি-খানি এস্থলে উদ্ধৃত করিলে অনেকের মনোরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে ঐ কথা হইতে কয়েক ছত্র মাত্র ও দুই একটী কবির গান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

সত্যনারায়ণ ব্রত-কথা।

শুন শুন সর্ব্বজন, হয়ে শুদ্ধ মন।
সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা, সত্য, সত্যনারায়ণ॥
ভকত অধীন প্রভু, ভকত বৎসল।
ভক্তিভাবে ভাবিলে হয়, সকল মঙ্গল॥
শ্রীগুরুচরণ চিন্তি, হয়ে শুদ্ধ মন।
আদিত্যাদি গ্রহগণে, করিনু বন্দন॥
গৌরীসুত গণেশের, চরণ বন্দিয়ে।
অনাদি অভয়া বন্দি, অবনী লোটায়ে॥
দিবাকর বন্দিলাম, যোড় করি হাত।
নন্দের নন্দন বন্দি, অখিলের নাথ॥
বন্দি দশমহাবিদ্যা, বিশ্বের জননী।
কালী কপালিনীকান্তা, করালবদনী॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদিদেব, বন্দি একেবারে।
গোপাল গোবিন্দ বন্দি, গোলোক ঈশ্বরে॥
নারায়ণ পাদপদ্মে, করিয়া প্রণতি।
শ্বেত সরসিজে বন্দি, লক্ষ্মী সরস্বতী॥
গয়া গঙ্গা আদি তীর্থ, বন্দিলাম যত।

বন্দিনু অনন্তদেব, আর বৈদ্যনাথ ॥
যোড় করে বন্দিলাম, জয় জগন্নাথ।
জাতি ভেদ নাই যথা, কিনে খায় ভাত ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি, বন্দি একেবারে।
জনক জননী বন্দি, শ্রেষ্ঠ এ সংসারে ॥
সাতস আউল সঙ্গে, সত্যপীর ভাবি।
বন্দিনু হদরেশ্বরে সাহেব সাসুফি ॥
যেখানে যেখানে পীর রন বিরাজিত।
সবাকার কদমে, সেলাম শত শত ॥
সত্য ত্রেতা, দ্বাপরের সেই যে ঈশ্বর।
কলিকালে কৃপা সিন্ধু, তিনি পয়গম্বর ॥

কবির গান।

(১)

চিতান। শ্রীদুর্গা, জয়দুর্গা,
জয় জয় দুর্গা, দুর্গাসুরঘাতিনী।
পরিচিতান। উমে, অম্বে, অন্নপূর্ণে,
অভয়ে, ভবভয় বিনাশকারিণী।
ফুকা। ত্রাহিমে ভবদুর্গমে, ভবানী।

ত্বং হি তারা, আদ্যা নিরাকারা,
পূর্ণপরাৎপরা ঈশানী।

মেল্‌তা। মাগো, ন জানামি স্তুতি,
তোমার হৈমবতী,
স্বগুণে নির্গুণে তার নিস্তারিণী॥

মহড়া। শরণাগতোহং তব শ্রীপদে তারিণী,
যদি কর হেন জ্ঞান,
ভজন পূজন বিহীন, এ দীন,
কিন্তু বেদাদিতে শুনি, "পতিত পাবনী"
নাম তোমার; ওমা, শিব-সীমন্তিনী।

খাদ। কৃপাং কুরু কাতরে, কৃপাকারিণী।

দ্বিতীয় ফুকা। "অভয়" কৃতান্ত হয়ে দেহ মা;
তোমা বিনা নিস্তারিতে
দীনে, নাই ত্রিভুবনে কেহ উমা।

দ্বিতীয় মেল্‌তা। শুনি অসীম মহিমা,
তব দুর্গানামে, মা,
তুমি গো, নিশুম্ভ, শুম্ভবিনাশিনী॥

---

(২)

১ম চিতান। অধৈর্য্য আকুল হয়ে অন্তরে,

অকূলে দুকূল ডুবাবে।

১ম পরিচিতান। ধৈর্য্যধর দুখ সওগো সই
দুই দিন বই জ্বালা জুড়াবে।

১ম ফুকা। সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়।
সুখান্তে দুখ হয়, দুখান্তে সুখের উদয়।

১ম মেল্‌তা। এদিন রবে না, ভেব না,
যাবে সই যন্ত্রণা,
সময়ে পাবে প্রাণবল্লভে,

মহড়া। পতির বিচ্ছেদে প্রাণসই,
অধৈর্য্য হলে কি হবে।
থাক নাথেরে ভাবিয়ে, আশাপথ চাহিয়ে,
আসি যার জ্বালা, সেই তোমায় জুড়াবে।

খাদ। কি সাধ্য রতিপতির বল গো,
সতীর অঙ্গ দহিবে।

২য় ফুকা। পূজ বিল্বদলে সতী-শঙ্করে
ঘুচিবে পতির দুখ, হেরিবে পতির মুখ
জুড়াবে তাপিত অন্তরে।

২য় মেল্‌তা। পাবে সময়ে প্রাণধন,
জুড়াবে প্রাণধন
দুরূহ বিরহ দায় ঘুচিবে।"

(৩)

১ম চিতান। প্রাণনাথ যে দেশে
আমার করিছে বিহার ;
১ম পরিচিতান। ঋতুরাজার সখী, তথা অধিকার
১ম ফুকা। তার শুভ সংবাদ যত,
সকলি ত জানে বসন্ত।
১ম মেল্‌তা। সুমঙ্গল কথা তার,
শুনালে হব সুখী,
মহড়া। বসন্তেরে সুধাও সখী,
আমার নাথের মঙ্গল কি ?
খাদ। নিবাসে নিদয় নাথ আস্‌বে না কি ?
২য় ফুকা। তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ,
দিন শতবার গণি দিন।
২য় মেল্‌তা। আসার আশায় আছি,
আশাপথ নিরখি।
অন্তরা। হায় কাল আসিবে বলে নাথ
করেছে গমন,
ভাগ্যগুণে যদি, হল সে মিথ্যাবাদী,
উপায় কি এখন।
২য় চিতান। সে যদি ভুলেছে আমারে,

মনে না করে,

২য় পরিচিতান। আমি কেমনে ভুলিব তারে।

৩য় ফুকা। পতি, গতি, মুক্তি অবলার,

সুখমোক্ষ সেইগো আমার;

৩য় মেল্‌তা। তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি॥

কৃষ্ণমোহনের পুত্র সন্তান ছিলনা। কেবল তিনটী মাত্র কন্যা ছিল। তাঁহার প্রথমা কন্যার নাম ঠাকুরাণী দাসী দেবী, দ্বিতীয়া কন্যার নাম লক্ষ্মীমণি দেবী ও তৃতীয়া কন্যার নাম মঙ্গলা দেবী। লক্ষ্মীমণি দেবী তাঁহার একটী মাত্র পুত্র সন্তান অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে রাখিয়া পর-লোক গমন করেন। অযোধ্যানাথ তাঁহার মাতা-মহের পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে তিনি গুরুতর পরি-শ্রম করিয়া স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। পরে স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদিব্রহ্ম সমাজের উপাচার্য্য ও আচার্য্য হন। বিখ্যাত স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর জীবন-চরিতে অযোধ্যানাথ সম্বন্ধে যে কয়েক ছত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক

হইলেও এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। "অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আদিব্রহ্ম সমাজের আচার্য্য ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতা শক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ইঁহার বক্তৃতা শক্তি এমন ছিল যে ইঁহার নাম আমি **Massilon of Bengal** রাখিয়া ছিলাম। ইঁনি এতদিন জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক উপকার সাধিত হইত।"

মঙ্গলা দেবীর বহু সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি একটী মাত্র বিধবা কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

নবীনচন্দ্র, পার্ব্বতীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতৃবিয়োগের সময় তাঁহার চারি বৎসর বয়ঃক্রম। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোপালচন্দ্র তাঁহাকে অকৃত্রিম স্নেহের সহিত প্রতিপালন করেন। গোপালচন্দ্রের অসাধারণ বিষয় বুদ্ধি ছিল। পিতৃবিয়োগের দারুণ শোক ভুলিয়া কি প্রকারে পৈতামহিক সম্পত্তি উদ্ধার করিব এই ভাবনা তাঁহার গুরুতর হইয়াছিল। যাহার যেমন ভাবনা, চেষ্টায় নারায়ণ তাহার সে ভাবনার ফল দান করেন। গোপালচন্দ্র বাল্যকালেই পার্ব্বতীচরণ

যে সকল ভূমি সম্পত্তি বন্ধক দিয়াছিলেন ক্রমে, ক্রমে, সমস্তই উদ্ধার করেন। যে সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া গিয়াছিলেন তাহা পুনরায় হস্তগত হওয়া অবশ্য দুঃসাধ্য। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার উত্তমর্ণগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পিতার অন্তরের বন্ধু ছিলেন। জেলা হুগলীর অন্তর্গত তেলিনীপাড়া গ্রামের স্বর্গীয় রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতৃবন্ধু ও একজন উত্তমর্ণ ছিলেন। রামধন বাবুর নিকট পার্ব্বতীচরণ কিছু টাকা খত লিখিয়া কর্জ্জ লন। কত টাকা কর্জ্জ লন, এতদিন পরে তাহা নিরূপণ করা যায় না, কিন্তু কথিত আছে, প্রায় তিন সহস্র টাকা হইবে। রামধন বাবুও একজন মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন ও কথিত আছে ইহার পরিণাম স্বরূপ দেওয়ানি কারাগৃহে কিয়দ্দিবস অবরুদ্ধ ছিলেন। পার্ব্বতীচরণের মৃত্যুর দিবসে তাঁহার গৃহে কিছুমাত্র অর্থ সঞ্চয় ছিলনা। কিন্তু মৃত্যুর ৮ দিবসের মধ্যে পার্ব্বতীচরণের তালুক হইতে নীল বিক্রয় হইয়া এককালে তিন সহস্র টাকা আমদানি হয়। গোপালের ঐ টাকা হস্তগত হইলে তিনি মনে

করিলেন পিতৃদায় হইতে কোন প্রকারে মুক্তি পাইব, কিন্তু ঋণমুক্ত হইবার চেষ্টা দেখা উচিত। এই মনে করিয়া পিতৃবন্ধু রামধন বাবুর নিকট ঐ তিন সহস্র টাকা লইয়া সাক্ষাৎ করিতে যান। শোকচিহ্নে সজ্জিত গোপালকে দেখিয়া রামধন বাবু গোপালকে বলিলেন "গোপাল! দেখিতেছি পার্ব্বতী দাদার কাল হইয়াছে। তুমি কি বাবা আমায় এই সংবাদ জানাইতে আসিয়াছ?" গোপাল বলিলেন "কাকা মহাশয়! আপনাকে এই দায় অগ্রে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য ও সেই সঙ্গে পৈত্রিক ঋণ হইতে মুক্ত হইব মনে করিয়াও আসিয়াছি" রামধন বাবু উত্তর করি-লেন "গোপাল! তোমার শুষ্ক মুখ দেখিয়া আর আমার তোমার নিকট হইতে ঋণ আদা-য়ের প্রবৃত্তি নাই, তবে আমিও অত্যন্ত ঋণ জালে জড়িত ও এই কারাগৃহে তাহার ফল-ভোগ করিতেছি। যাহা হউক তুমি কত টাকা আনিয়াছ?" গোপাল উত্তর করিলেন "তিন সহস্র টাকা নীল কুঠি হইতে আসিয়াছিল সমস্ত টাকাই আপনার নিকট আনিয়াছি; তিল কাঞ্চন

করিয়া পিতৃদায় হইতে উদ্ধার হইব মনে করিয়াছি” রামধন বাবু উত্তর করিলেন “তুমি বড় বুদ্ধিমান ছেলে; তোমার নারায়ণ মঙ্গল করুন। বাবা! আমায় এক সহস্র টাকা ভিক্ষার স্বরূপ দাও আমি তোমাকে ঋণ দায় হইতে মুক্তি দিতেছি; কিন্তু বাবা! বক্রী দুই সহস্র টাকায় দাদার শ্রাদ্ধ ভাল করিয়া করিও।” তিন সহস্র টাকার পরিবর্ত্তে এক সহস্র টাকা লইয়া মুক্তি-দান! গোপাল পিতৃবন্ধুর বদান্যতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। এখনকার কালে চারি টাকা দান করিলে, দশ টাকা দান, সংবাদ পত্রের তালিকায় না ছাপাইয়া দাতার নিদ্রা হয় না ও তৎপরেই রাজদ্বারে উপাধি পাইবার চেষ্টা হইতে থাকে।

প্রতিজ্ঞা বলে মানব কি করিতে পারে তাহা গোপাল দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরমাত্মীয় পর্য্যন্ত অদিনে তাঁহাকে বিপদাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই। বংশ পরম্পরা সঞ্চিত পুণ্যের ফল কোথায় যাইবে? গোপালচন্দ্র অতি অল্প

দিনে পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার করিয়া পিতা ও পিতামহের গৌরব পূর্ণমাত্রায় বজায় করিয়া সন ১২৭০ সালে (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) ৪১ বৎসর বয়সে পুণ্যতীর্থ কাশীক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি বৃদ্ধা মাতা পার্ব্বতীচরণের সহধর্ম্মিণীকে কাশীধামে বাসের উদ্দেশে লইয়া যান। কাশী-বাসের ১৪।১৫ দিবস পরেই তাঁহার উৎকট বিসূচিকা রোগ হয়। তাঁহার পীড়ার সময় বৃদ্ধা মাতা শয্যাগতা হইয়া অপর একটী গৃহে বিশ্বে-শ্বরের শরণাপন্ন হইয়া প'ড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের কঠিন রোগের কথা তাঁহাকে অবগত করান যুক্তিযুক্ত জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু ঘটনা-ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহার গোপালের বিসূচিকা রোগ হইয়াছে। পাঠক! অবিশ্বাস করিবেন না; আমার লিখিত একবর্ণও স্বকপোল কল্পিত নহে। শুনিবামাত্র বৃদ্ধা ঠাকুরাণী দাসী কেবলমাত্র এই কথা বলিলেন "আমার গোপা-লের এমন রোগ হইয়াছে।" যে বলা সেই দেহত্যাগ, চক্ষু কপালে উঠিল, নিশ্বাস রোধ হইল, সাধনার ধন বিশ্বনাথ সহায় হইলেন, তিনি

গোপালকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। গোপালকে মাতৃ বিয়োগের কথা শুনান হইল। গোপাল একটু হাসিলেন ও উত্তর করিলেন "আমারও বিলম্ব নাই।" যাঁহারা গোপাল ও ঠাকুরাণী দাসী দেবীকে লইয়া কাশী যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা ঠাকুরাণী দাসীকে মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিয়া আসিয়া দেখেন যে গোপালেরও প্রাণান্ত হইয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যভার গোপালের শব দাহ না করিলে শেষ হইবে না, কাজেই সে কার্য্য সমাধা করা হইল।

নবীন চারি বৎসর বয়সে পিতৃহারা হইয়াছিলেন। পিতার অতুলনীয় ও পবিত্র বাৎসল্যভাব নবীন ভাগ্য দোষে অনুভব করিতে পান নাই। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সহোদরের ভালবাসা তিনি পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা যে কি স্নেহের সামগ্রী তাহা গোপাল জানিতেন। এমন আদর্শ ভ্রাতৃস্নেহ, কদাচ কাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়। নবীনও জ্যেষ্ঠকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু সংবাদে নবীন মর্ম্মাহত হন। বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইতে তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত

ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের অকাল মৃত্যুতে তিনি একেবারেই শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। এই তাঁহার জীবনে প্রথম শোক। এ অল্প বয়সে তাঁহার শোক দমনের শক্তি তাদৃশ জন্মায় নাই। সুতরাং এই সময় তিনি অধিকক্ষণ একাকী থাকিতেন ও বহুদিন পর্য্যন্ত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। কালক্রমে শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্রাধিক স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃ শোক কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হয়। ৩৭ বৎসর পরে যখন নবীন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন অজ্ঞানাবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালচন্দ্রকে মস্তকের নিকট বসিতে দেখিয়া "দাদা আসিয়াছ" এই কথাটি বলিয়াছিলেন।

ভগিনী শ্রীমতী রাখালদাসী দেবী পিতার একমাত্র কন্যা বিধায়ে বাল্যকাল হইতে বড় আদরের ছিলেন। কিন্তু পার্ব্বতীচরণ কন্যার বিবাহ দিয়া যাইতে পারেন নাই। হুগলী জেলার অন্তর্গত খামারগাছি গ্রামের স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মহেশচন্দ্র বল্লাল সেনের স্থাপিত বিশিষ্ট কুলগৌরবে গৌরবা-

ন্বিত ও বহুপত্নীক ছিলেন। সুতরাং শ্রীমতী রাখাল দাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের বা পিতৃ অন্নে প্রতিপালিতা। এমন সাধ্বী আত্মত্যাগিনী নারী আমি কখনও দৃষ্টি-গোচর করি নাই। আমার চক্ষে তিনি আদর্শ হিন্দু রমণী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালচন্দ্রের মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পরেই তিনি বিধবা হন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার যত কিছু ভালবাসা হৃদয়ে ছিল, সমস্তই কনিষ্ঠ নবীনচন্দ্রে অর্পিত হইত। তিনি বৈধব্যাবস্থায় একান্ত কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন। গৃহ-দেবতা ৺ মদনগোপাল ঠাকুরের মন্দিরে তাঁহার দিবাভাগের অধিকাংশ কাটিয়া যাইত। ভগবদ্গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোক "যৎকরোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপশ্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্বমদর্পণং" পাঠে মনে হয়, যাহা দেখা যায় তাহা কি আবার শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ হয়? আমি সদর্পে বলিতে পারি, যিনি শ্রীমতী রাখাল দাসীর শেষ জীবন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তিনি বলিবেন যে হিন্দু বিধবা পার্থিব সকল দ্রব্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে জানেন, হিন্দু বিধবা জগদীশ্বরের সৃষ্টির অপূর্ব্ব সামগ্রী, হিন্দু বিধবা ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের

স্মৃতি চিহ্ন, ও হিন্দু বিধবা নিষ্কামধর্ম্মের আকর ভূমি। আর্য্যঋষিগণের রচিত নিষ্কামধর্ম্মের গ্রন্থাবলী পাঠে যে ত্যাগ শিক্ষা পাওয়া যায়, মনো নিবেশ পূর্ব্বক যথার্থ হিন্দু বিধবার জীবন লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ ত্যাগ শিক্ষা হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্রকে রাখিয়া তিনি কেমন করিয়া অগ্রে পরলোকে চলিয়া যাইবেন, এই তাঁহার একটী ভাবনার বিষয় ছিল। গৃহে কোন জ্যোতিষী আসিলে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে বলিতেন "অরে! আমার একটু গণনা করাইয়া দে না" জ্যোতিষী উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিতে বলিলে তিনি প্রশ্ন করিতেন "বল দেখি আমি নবীনকে রাখিয়া যাইতে পারিব কিনা"। বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণপ্রাণা দেবীসদৃশী রাখাল দাসীর অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছিল। সন ১৩০৭ সালের ১৭ই শ্রাবণে নবীনচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন আর সন ১৩০৬ সালের ১৬ই শ্রাবণে রাখাল দাসী স্বর্গারোহণ করেন।

নবীন বাল্যকাল হইতেই একান্ত ধীর, নম্র ও বিনয়াবনত ছিলেন। বিদ্যার্থী হইয়া ১৮৪৭

খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে (সন ১২৫৩ ৪ঠা ফাল্গুন) তিনি হুগলীর মহম্মদ্ মসিনের কলেজে প্রবেশ করেন। সে সময় **Mr Graves M. A.** মহোদয় ইস্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং **Captain D. L. Richardson** মহোদয় কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। নবীনের বিশুদ্ধ স্বভাবের প্রশংসা পত্র দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার সমসাময়িক ছাত্রবৃন্দের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্বভাবের জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ইংরেজ কবি **Wordsworth** স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াগিয়াছেন **"Child is father of the Man"**। নবীন চন্দ্রের বাল্যাবস্থা হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত জীবনের ধারা বিচক্ষণ দৃষ্টিতে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে **Wordsworth** যথার্থ মানব চরিত্রের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

নবীন তাদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন না। সে সময়ে সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ছিল না। তখনকার দিনে ইংরাজী ভাষায় যে দুই দশখানি জীবনী এ দেশে সর্ব্বদা পঠিত হইত, ও বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত কাশীরাম দাসের

মহাভারত, চণ্ডীদাস, ও কবিকঙ্কণ তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন ও তৎসঙ্গে বহুবিবাহ যে সমাজের কত অকল্যাণ করিয়াছিল এই বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মসিন কলেজের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য (শিরোমণি) মহাশয় ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। এ প্রবন্ধটী যে কাগজে লিখিত ছিল তাহা কালধর্ম্মে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সংস্কার করিয়া নিম্নে তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম বটে, কিন্তু লুপ্ত অংশ পূরণ করিতে, মুল রচনা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

"বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ।

বাঙ্গালায় কৌলীন্য প্রথার ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে বাঙ্গালায় কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপিত হয় সে সময়ের বাঙ্গালার বিশ্বাস যোগ্য ইতিহাসের বড় অভাব, সুতরাং এসম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইবে, তাহা বিদেশীয় গ্রন্থের সাহায্যে ও স্থানে স্থানে কিংবদন্তির প্রতি নির্ভর করিয়া লিখিতে হইবে। কোন্ সময়ে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বৈদ্যবংশ সম্ভূত রাজা আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে

অধিরূঢ় ছিলেন ও পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে প্রথম আগমন করেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। এ সম্বন্ধে বহুমত প্রচলিত আছে। তবে নানা কারণে অনুমান হয় যে খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। আদিশূরের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা নিশ্চয় করা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন গৌড়রাজ্যের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পাঁড়ুয়া নগরী। এই পাঁড়ুয়ার ধ্বংসাবশেষ মালদহের ৮।১০ ক্রোশ দূরে দৃষ্ট হয়। রাজা আদিশূরের সময়ে গৌড় দেশে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অনুমান, এই ব্রাহ্মণগণ বেদপারগ ছিলেন না। রাজা আদিশূরের তাঁহাদের প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা ছিল। রাজার পুত্র সন্তান না থাকায় যথা শাস্ত্র পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার একান্ত বাসনা হয়। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ এই কর্ম্মের উপযুক্ত নহে এই ধারণায় রাজা, কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম শাণ্ডিল্য গোত্রধারী ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রধারী দক্ষ, ভরদ্বাজ গোত্রধারী শ্রীহর্ষ, বাৎস্য গোত্রধারী ছান্দড় ও সাবর্ণ গোত্রধারী বেদগর্ভ।

বেদবাণার্ক শাকেতু গৌড় বিপ্রা সমাগতাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষ শ্ছান্দড়ো বেদগর্ভকঃ।
অথ শ্রীহর্ষ নামাচ সাগ্নিক বংশ সম্ভবাঃ।
আয়াতাঃ পঞ্চ বিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জ প্রদেশতঃ।
সস্ত্রীকাঃ সহপুত্রৈশ্চ সহভৃত্যৈশ্চতে তথা।

পুত্রেষ্টি যাগ সমাপ্ত হইলে রাজা উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে গৌড় রাজ্যে বাসের অনুরোধ করিয়া পাঁচখানি গ্রাম দেন।

যথা; দক্ষকে কামকোটী, শ্রীহর্ষকে কঙ্ক, ভট্টনারায়ণকে পঞ্চ-কোটী, ছান্দড়কে হয়কোটী ও বেদগর্ভকে বটগ্রাম নামক গ্রাম দেন।

কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের মতে এই পাঁচ ব্রাহ্মণের ক্রমে ক্রমে ছাপান্নটী পুত্র জন্মে। যথা দক্ষের ১৪ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র, ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র, ছান্দড়ের ১১ পুত্র ও বেদগর্ভেরও ১১ পুত্র জন্মে। ইহারা রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমে ৫৬ খানি গ্রাম পান। যিনি যে গ্রাম পান তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ সেই গ্রামীণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। যেমন দক্ষের পুত্র কৃষ্ণ দগ্ধবাটী বা পোড়াবাটী গ্রাম বাসার্থ পান। এইজন্য কৃষ্ণের বংশধরগণ অদ্যাবধি দগ্ধবাটী বা পোড়াবাটী গ্রামীণ বা গাঞী বলিয়া অভিহিত হন। এই ৫৬ খানি গ্রামের বর্ত্তমান নাম ও তাহাদের কোথায় স্থিতি তাহা নির্দ্ধারণ করা অতিশয় কঠিন। তবে ইহা অনেকটা স্থির যে বাঙ্গালার যে ভূমিখণ্ড ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ তাহার নাম রাঢ়, আর যে ভূমিখণ্ড পদ্মার উত্তর এবং করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী তাহার নাম বরেন্দ্র। অনুমান হয়, যে বর্ত্তমান হুগলী বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলা গুলি রাঢ়ভূমি অধিকার করিয়া আছে ও দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা গুলি বরেন্দ্র ভূমি অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং উক্ত ৫৬ খানি গ্রাম উক্ত কয়েকটী জেলার মধ্যে স্থিত। হিন্দু রাজকুলের লোপ পাইলে, মুসলমান ও মহা-রাষ্ট্রীয়গণের দৌরাত্ম্যে ও অপরাপর কারণে উক্ত ৫৬ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন।

রাজা আদিশূরের বংশ ধ্বংস হইলে, সেন বংশীয় রাজারা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশের আদিপুরুষের নাম বীর সেন। বীর সেনের বংশীয় হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন। তৎপুত্র বল্লাল সেন খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকৃত রাজত্ব সুশাসনের জন্য তিনি উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। (১) রাঢ় (২) বরেন্দ্র (৩) বাগড়ি (৪) বঙ্গ (৫) মিথিলা। এই কয়েকটী স্থানের মধ্যে তিনটি রাজধানী স্থাপিত হয় (১) সুবর্ণপুর (২) গৌড় (৩) নবদ্বীপ।

তিনি দেখিলেন যে আদিশূর আনিত বেদপারগ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সন্তানগণ মধ্যে অধিকাংশেরই বেদাধ্যয়নে যত্ন নাই ও আচার ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। তন্নিবারণার্থে তিনি কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন। তিনি নিয়ম করিলেন যে কান্য-কুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান এই নবগুণ বিশিষ্ট তাঁহারাই উচ্চ শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ হইবেন ও কুলীন সংজ্ঞা পাইবেন।

এই নিয়মানুসারে বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী প্রভৃতি অষ্ট গ্রামীণ ব্রাহ্মণগণ কুলীন হইলেন এবং পালধি প্রভৃতি ৩৪টী গ্রামীণ ব্রাহ্মণগণ অষ্টগুণ বিশিষ্ট বলিয়া ইঁহারা শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট ১৪ খানি গ্রামীণ ব্রাহ্মণগণ সদাচার পরিভ্রষ্ট-ছিলেন এই জন্য গৌণ কুলীন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্যক্তিগত সদাচার কাহার কত পরিমাণে আছে তাহা স্থির করিবার জন্য রাজা বল্লাল সেন এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন

করেন। অস্মদ্দেশে বহুকালাবধি জনশ্রুতি আছে, যে বল্লাল সেন, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মর্য্যাদা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে দানের যথাযোগ্য পাত্র নির্ব্বাচনের জন্য একটী দিন স্থির করিয়া এক মহাসভা আহ্বান করেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ উক্ত সভায় বেলা দেড় প্রহরের পূর্ব্বে আসিবেন, তাঁহারা আহ্নিক পূজা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম যথাবিধি করেন না সুতরাং তাহাদের আচার, বিদ্যা প্রভৃতি গুণের অভাব। যাঁহারা দেড় প্রহরের পরে আসিবেন তাঁহারা যথাবিধি সদনুষ্ঠান করেন। এই নিয়মানুসারে নির্ব্বাচনের স্থির করিয়া কাহাকেও কুলীন কাহাকেও গৌণ কুলীন, কাহাকেও শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেন। অর্থাৎ যাঁহারা দেড় প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নূতন মর্য্যাদা দেন। যাঁহারা দেড় প্রহরের পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের একেবারে আচারভ্রষ্ট বলিয়া হেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন ও যাঁহারা দেড় প্রহরের অনেক পরে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কুলীন সংজ্ঞা প্রদান করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরে রাজা লক্ষণ সেন কুলের অংশ নির্ণয় করেন ও লক্ষণ সেনের পুত্র দনৌজমাধব কুলের অংশের বিচার করেন। ফলতঃ এখন হইতে নিয়ম হয় যে কুলীনেরা কুলীনের সহিত পরিবর্ত্ত বা আদান প্রদান করিবেন। তাঁহারা শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিলে বংশজ হইবেন ও গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে একেবারেই কুল নষ্ট হইবে। রাজা দনৌজমাধবের পরে কতিপয় মুসলমান রাজার সভার মন্ত্রী দন্তখাস নামক এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার অনু-

সারে কুল বিচারে হস্তক্ষেপ করেন। সম্ভবতঃ ইহার পর হইতেই কুল বিচার সম্পূর্ণরূপে ঘটকগণের হস্তে পড়ে।

কুলীনদিগের গুণ দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারাই পরে ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজের উপর অসাধারণ আধিপত্য করেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এড়ূমিশ্র, হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দ, বাচস্পতিমিশ্র, দনুজারিমিশ্র, দেবীবর প্রভৃতি অতিশয় আধিপত্য বিস্তার করেন। সম্বন্ধনির্ণয়ের সময় বর ও কন্যা পক্ষের দোষ গুণ বিচার ভার তাঁহাদের হস্তে ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৫ শতাব্দে দেবীবরের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে সময় বাঙ্গালার সিংহাসনে ইউসুফ সাহ অধিরূঢ়। দেবীবরের ক্ষমতার সীমা ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণগণের কুল বিচারে যাহা নিষ্পত্তি করিতেন তাহাই হইত। এই জন্যই বোধ হয় প্রবাদ আছে যে তিনি স্বীয় ইষ্টদেবীর সাধনা করিয়া দেবীর বরপুত্র হয়েন ও অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। এই ক্ষমতা সর্ব্বত্র অনুভূত হইত। এমন কি তাঁহার ক্ষমতা তাঁহার মাতৃষস্রেয় ভ্রাতা পণ্ডিত যোগেশ্বরকেও অনুভব করিতে হইয়াছিল। যোগেশ্বর, দেবীবর অপেক্ষা পণ্ডিত হইলেও স্বীয় কুলমর্য্যাদার জন্য দেবীবরকে উপাসনা করিতে হইত। দেবীবরের এতই প্রভাব ছিল যে বল্লাল সেনের ন্যায় তিনিও এই হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণগণের কুল বিধান করেন। এই কুলবিধানে যাঁহারা অনুমোদন করেন নাই, তাঁহাদিগকে দেবীবর ছাঁটিয়া ফেলেন, অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করেন। এই জন্য একটী সাধারণ কথা প্রচলিত আছে "দেবীবরা ছাঁটা বংশজ"। ফলতঃ তৎকালে যাঁহারা দেবীবরের ন্যায় ঘটকের অপ্রয়া

স্বয়ং দেবীবরের মনস্তুষ্টি না করিতে পারিতেন তাঁহাদের মস্তক উন্নত করিবার উপায় ছিল না। তবে সে দুর্দ্দিনেও এমন অনেক তেজস্বী সৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁহারা এই বিখ্যাত ঘটক সম্প্রদায়কে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া গৌরবের সহিত স্ববংশের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে রাজা বল্লাল সেনের কুলীন ব্রাহ্মণের এই ইতিহাস।

এক্ষণে এই কৌলীন্য প্রথা সমাজের কি অকল্যাণ করিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। সমাজে যখন যে ব্যক্তি মান্য গণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়েন বা যাঁহাকে রাজা সম্মানিত করেন তাঁহার বা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধে নিবদ্ধ হওয়া এক প্রকার বাঞ্ছনীয় বলিলেও হয়। সুতরাং তৎকালে যাঁহারা প্রধান বা মুখ্য কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কন্যাদান করিয়া স্ববংশের গৌরব বৃদ্ধি করা সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছিল। কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম ছিল, অকুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাগণের সংখ্যা অধিক ছিল, সুতরাং একজন কুলীন ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় বা অনুরোধে একের অধিক দার পরিগ্রহ করিতেন। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক কন্যা বিবাহ করিতেন। এই বহুবিবাহের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রী বিবাহাবধি স্বামীর মুখদর্শন করিতে পাইতেন না। লৌকিক হিসাবে অর্থের শক্তি চিরকালই অধিক। যে কন্যার পিতা তাঁহার জামাতাকে অর্থ সাহায্যের দ্বারা সম্মানিত করিতে পারিতেন সেই কন্যারই ভাগ্যে স্বামীদর্শন হইত। অর্থহীন পিতার কন্যা, স্বামী স্বত্বেও বিধবা হইত। এক সময় এই কারণে সমাজ পাপের স্রোতে ভাসিয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে অস্মদ্দেশে কবির গানের বড় আদর ছিল। গায়কদিগের মধ্যে দুইটী দল থাকিত। একদলকে পূর্ব্বপক্ষ, অপর দলকে উত্তরপক্ষ বলা হইত। পূর্ব্বপক্ষ যাহা প্রস্তাব করিত, উত্তরপক্ষ তাহার উত্তর দিত। কথিত আছে, কৌলীন্য প্রথার ফল সমাজে এত নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে সমাজ সংস্করণের জন্য গায়কগণের সহায়তায় ভদ্রসন্তানগণ সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে কুলীন সন্তানগণকে শ্লেষবাক্যের দ্বারা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন। এই গায়কগণের প্রভাবে কিছুদিনের জন্য কুলীন সন্তানগণকে আপনাদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতে হইত। এদিকে অকুলীন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ হওয়া ভার হইয়াছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে তাহাদের কন্যা ক্রয় করিতে হইত। অর্থহীন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণগণের বংশ প্রায় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই প্রকার সামাজিক দুর্গতির সীমা ছিল না। নদীর স্রোত যখন যে দিকে প্রবল বহে তখন কিছুতেই সে স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করা যায় না। এদিকে ধর্ম্মের দারুণ গ্লানি হইলেই ভগবান স্বয়ং অধর্ম্মের দমন করিয়া থাকেন। ভগবানের এই নিত্য কর্ম্ম। কুলীনদিগের পূর্ব্ব গৌরব খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। শ্রোত্রিয়গণও সঙ্গে সঙ্গে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। মনুশাসিত দেশে অদূরদর্শী বল্লালসেনের ভ্রম পদে পদে দেশের লোক বুঝিতে পারিয়াছে। অগাধ 'বুদ্ধি, দেবসদৃশ, মহাজ্ঞানী, মনু গুরুগম্ভীর বাক্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ করা বিহিত কর্ম্ম। তিনি জ্ঞানের সতত পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানোপার্জ্জনে যত্নবান, যে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ্টোমাদি, যাগাধিকারী, যে ব্রাহ্মণ বিদ্বান, যে

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর, যাঁহার কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি আছে, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। আর যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানী, কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত, তিনি কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তীর ন্যায় বা চর্ম্মরহিত মৃগের ন্যায় নামমাত্র ব্রাহ্মণ।

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

সকল কালেই যাহাতে জ্ঞানোপার্জ্জনে বা কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ব্রাহ্মণগণ যত্নবান থাকেন তাঁহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ব্যবস্থার গৌরব ভারতক্ষেত্রে চিরদিনেই সমান থাকিবে। ইহার সহিত তুলনায় বল্লালসেনের ব্যবস্থা হাস্যোদ্দীপক মাত্র। মূর্খ বল্লালীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী মাত্র। তবে বল্লালীয় কুলীনগণের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দেশপূজ্য মনুর প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বোক্ত কয়েক ছত্র কোন্ ব্যক্তিগত নিন্দা উদ্দেশ্যে লিখিত হইল না। প্রার্থনা করি, কেহ যেন ইহাতে উত্তপ্ত না হন। মনুর প্রশংসিত ব্যবস্থার সহিত তুলনায় অদূরদর্শী বল্লালসেনের সমাজ-বন্দন ভ্রমমূলক এই মাত্র লেখা হইল। মনুর ব্যবস্থা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রশংসা যেন আমাদের দেশের লোক চিরকাল স্মরণে রাখেন আমার এই প্রার্থনা। কিমধিকমিতি।”

সন ১২৬৩ সালে (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) নবীনচন্দ্র ব্যবস্থাশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও তাৎকালিক নিয়মানুসারে ও পরীক্ষার ফল বিচারে সদর আমিন

আদালত পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক সচ্ছন্দতা ছিল না বলিয়া ও অপরাপর কারণে তিনি ব্যবহারজীবের ব্যবসায় প্রবেশ করেন নাই।

মাতামহ স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহনের ন্যায় নবীনচন্দ্র বড় কবিতা প্রিয় ছিলেন। নবীনচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ অস্মদ্দেশের প্রসিদ্ধ নীলমণি পাটুনী ও নীলু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালা দিগের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করেন। নবীনও দাশরথি রায়ের পাঁচালী ও গোবিন্দ দাসের "মান" ও "মাথুর" শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। ভট্ট-পল্লী নিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক কাশীবাসী মহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত একত্রে বসিয়া কোন পূজোপলক্ষে স্বগৃহে সমস্ত রাত্রি গোবিন্দদাসের "মান" ও "মাথুর" শুনিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও একজন নিপুণ কবি। সে সময় ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর, সাহিত্য জগতে বড় আদৃত হইত ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ—প্রভাকর সাহিত্যাকাশে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যকিরণ বিস্তার করিয়া দিগন্ত

প্লাবিত করিতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে চণ্ডী, মনু-সংহিতা, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা পুস্তকগুলি পবিত্র জ্ঞানে ভক্তিমান হইয়া এক মনে সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। ঐ সকল পুস্তক পাঠে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল জ্ঞান হইলে ভারতচন্দ্রের ও গুপ্ত কবির ও কখন কখন চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের রচিত গ্রন্থ কোন বন্ধুকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন ও আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। মাতামহ কৃষ্ণমোহনের ন্যায় তাঁহার কবিতা রচনাশক্তি কিঞ্চিৎ ছিল। তাঁহার রচিত কবিতা গুলি অনাদৃত হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দুই চারিটী যাহা আমার হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইটীমাত্র আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

"ভগবল্লীলা।

এ ব্রহ্মাণ্ডে অহর্নিশ, যাহা যাহা ঘটে।
একই ঈশ্বর তুমি, তব কার্য্য বটে॥
তবু তুমি ত্রেতাযুগে, রামরূপ ধরি।
পৃথিবীতে অবতীর্ণ, হয়েছিলে হরি॥
ধর্ম্মের মহিমা যাতে, বাড়ে, ধরাতলে।
রাবণেরে বধেছিলে, কতই কৌশলে॥

নতুবা তোমার সীতা, কে হরিতে পারে ?
ব্রহ্মাণ্ডের ধাত্রী যিনি, দেবী জানকীরে ॥
দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপে, দেবকী উদরে।
একই ঈশ্বর তুমি, জন্মেছিলে পরে ॥
সকলি তোমার, তবু, ননি চুরি করি।
অপবাদ লয়ে ছিলে, কেন বল হরি ? ॥
লীলাতত্ত্ব বুঝাইতে, অবোধ মানবে।
কত কষ্ট করেছিলে, বধিতে দানবে ॥
বীর হনুমান্ বলে, তুমি বলীয়ান্।
এ কথা কি মানি আমি, যদিও অজ্ঞান ? ॥
তুমিই রাবণ আর, তুমি নারায়ণ।
এক শক্তি দুইরূপে, হও দীপ্যমান ॥
সংসারের আবর্ত্তনে, দৃষ্টিহীন হয়ে।
সদাই প্রমাদ দেখি, অন্তরে কাঁপিয়ে ॥
লীলাতত্ত্ব বুঝিবারে, জ্ঞান দাও হরি।
কর যোড়ে গল বস্ত্রে, তব পায়ে ধরি ॥”

---

(২)

“প্রার্থনা।

অনন্ত সৃষ্টির মাঝে, আমি বুদ্ধিহীন।
কেমনেতে সৃষ্টি হলো, ভাবি রাতি দিন ॥
কেমনে আকাশ হলো, কেমনেতে ব্যোম।
কেমনেতে দিবাকর, কেমনেতে সোম ॥

কেমনে অগণ্য তারা, আকাশে উদিত।
পুরুষে প্রকৃতি সদা, কেমনে মিলিত॥
কি হতে মানব জন্মে, কি হতে পতঙ্গ।
সবার সুন্দর দেহ, মনোহর অঙ্গ॥
কেমনেতে সর্ব্ব জীব, বুদ্ধি বৃত্তি পায়।
দেহ ধ্বংসে কেমনেতে, সব চলে যায়॥
দয়া, মায়া, মোহ, লোভ, কোথা হতে আসে।
দুখে সুখে কেন জীব, কাঁদে আর হাসে॥
যে ভেবেছে, সৃষ্টিতত্ত্ব, আপন অন্তরে।
নিগূঢ় নিয়ম পাবে, তাহার ভিতরে॥
সূর্য্যকে বেষ্টিয়া ধরা, কেমন ঘুরিছে।
তাহার চৌদিকে চাঁদ, কেমন বেড়িছে॥
শনি, শুক্র, গ্রহগণ, চক্রাকারে ধায়।
ভৃত্যবৎ দিবানিশি, কাহার আজ্ঞায়॥
একেরে অপরে করে, নিত্য আকর্ষণ।
বিপর্য্যয় কভু নয়, তার কদাচন॥
এদিকে আবার দেখ, পিপীলিকাগণ।
সারি গেঁথে মধু গন্ধে, ধায় অনুক্ষণ॥
ছোট নাকে ঘ্রাণশক্তি, ছোট পায়ে বল।
ছোট চোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অদ্ভুত সকল॥
পক্ষিগণ নীড় হতে কত দূরে ধায়।
শাবকের ক্ষুধা জ্বালা, নিবৃত্তি আশায়॥
তাদের প্রবৃত্তি আছে, তাদেরো নিবৃত্তি।
মায়া, মোহ, প্রীতি, স্নেহ, আরো কত বৃত্তি॥

বড় দেখ, ছোট দেখ, যাহাই দেখিবে।
সকলি অদ্ভুত ভাবি, বিস্মিত হইবে॥
সবেতে অমৃত আছে, সবেতে গরল।
উভয়ের সমাবেশ, আশ্চর্য্য কৌশল॥
যে বলে বুঝেছি আমি, সৃষ্টির ব্যাপার।
অজ্ঞান সমুদ্রে ভাসে, নাহি পারাবার॥
বুঝেছিল এক দিন, এক রথে বসি।
ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে, বিপুল সাহসী॥
বিচিত্র আকার দেখে, কাঁপিয়ে অধীর।
দিব্যজ্ঞান পেয়েছিল, পার্থ মহাবীর॥
সৃষ্টিময় কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে যেই জন।
শ্রীকৃষ্ণে সকলি দেখে, ধন্য তিনি হন॥
কত দিনে কৃষ্ণময় দেখিয়ে সংসার।
জীবন সফল করি যাব ভব পার॥"

কবিতা দুইটি কেমন তৎসম্বন্ধে মতামত পাঠকের হস্তে। তবে একথা বলিতে ক্ষতি নাই যে মাতামহের কবিতার ছন্দের ও ভাবের সহিত দৌহিত্রের কবিতার সাদৃশ্য আছে। সত্যনারায়ণ কথায় আদিত্যাদি গ্রহগণ হইতে সাসুফি পর্য্যন্ত সকলের বন্দনা ও "কদমে শত শত সেলাম" করিয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের একই ঈশ্বর বুঝিয়া কৃষ্ণমোহন সত্যনারায়ণ কথা আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন। নবীনচন্দ্রও ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে দিবাকর ও অগণ্য তারকাবৃন্দে একই মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণে লীন দেখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কবিতাটিতে যেন মাতামহের সংস্কার ও সর্ব্বদা গীতা পাঠের জন্য অর্জ্জিত জ্ঞান মিশ্রিত।

গোপালচন্দ্র যখন মানবলীলা সম্বরণ করেন তখন নবীনের বয়ঃক্রম অন্যূন ২৯ বৎসর। একে অপরকে কার্য্যভার দিয়া ইহ সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সংসারের এই সাধারণ নিয়ম। গোপাল আপন কার্য্য করিয়া চলিয়া গেলেন, আর চারি বৎসরের এক শিশু পুত্রকে রাখিয়া গেলেন। পার্ব্বতীচরণের দেহান্তে যেমন গোপালচন্দ্র চারি বৎসরের কনিষ্ঠ সহোদর নবীনকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, নবীনও ততোধিক যত্ন সহকারে চারি বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সহোদরে আর সহোদর পুত্রে প্রভেদ আছে। সহোদরে যেমন স্বাভাবিক এক অসীম যত্ন সম্ভবে, পুত্রে যেমন স্বদেহাপেক্ষায় যত্ন হয়, সহোদর পুত্রে সে যত্ন তত স্বাভাবিক নহে, কিন্তু নবীন ইন্দ্রিয় সংযমী পুরুষ ছিলেন।

যাহা অপরের পক্ষে কঠিন তাহা নবীনের সহজ। তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র যে উপকার তাঁহার করিয়াছিলেন সে উপকার তিনি এক দিবসের জন্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি যে ভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন সে ভাব সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন অকৃত্রিম স্নেহ আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে যখন যৌবন সুলভ ভোগ বাসনা বলবতী, সে সময়ে নবীন আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন, দরিদ্রের যথাসাধ্য দুঃখমোচন, স্বীয় অধিকৃত গ্রামগুলির মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন স্বগৃহে দেবদেবীর অর্চ্চনা ও ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহাকে কৃতবিদ্য করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঋণশোধ করিবেন এই ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। নবীন ৩০ বৎসর কাল একাদিক্রমে চারি বৎসরের শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া ও তাঁহাকে একজন কৃতবিদ্য পুরুষ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। সংসার

সুবন্দোবস্তে রাখিয়া তথায় একটী শান্তি নিকেতন স্থাপনা করা কেবলমাত্র কঠিন নহে, বিশেষ ভাগ্য সাপেক্ষ। যত্নে, ও অদৃষ্টবলে নবীনের সংসার অতি সুখের সংসার ছিল। তাঁহার সংসারে অধৰ্ম্মের লেশমাত্র ছিল না। হিন্দু গৃহস্থাশ্রম যদি পবিত্র হয় তাহা হইলে উহা সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ও য়ুরোপীয় জগতের অনুকরণীয়। পবিত্র আশ্রমে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আগমন আপনা হইতেই হয়। আর তাঁহার দেবদেবীর অর্চ্চনার কথা কি লিখিব। এই দেবদেবীর অর্চ্চনা প্রবৃত্তিই তাঁহার চরিত্রের মূল ভিত্তি। বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নবীনের বাটীতে এমন দিন ছিল না যে দিন তিনি দেব বা পিতৃ পূজায় ব্যস্ত না থাকিতেন। সন ১৩০৭ সালের ১৭ই শ্রাবণে নবীনচন্দ্র ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, আর তৎপূৰ্ব্বে ৯ই শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যুরোগের সঞ্চার হয়। ঐ দিবস তাঁহার স্বর্গীয় পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূৰ্ব্ব হইতে উদরাময় রোগে কষ্ট পাইয়া তাঁহার দেহ চৰ্ম্মাবশিষ্ট হইয়াছিল। ৯ই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি বহু কষ্টে পিতৃ-

দেবের শ্রাদ্ধ করিতে বসেন। এক প্রকার উত্থান শক্তি রহিত দেখিয়া তাঁহার পত্নী ঐ কর্ম্ম তাঁহাকে সময়ান্তরে করিতে উপদেশ দিলে তিনি তাঁহাকে বলেন "কেন বিরক্ত করিতেছ, যাবৎ দেহ আছে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।" তিনি প্রপিতামহ ও প্রমাতামহ পর্য্যন্ত বার্ষিক শ্রাদ্ধ যথাদিনে আজীবন করিয়াছিলেন। শারদীয় মহা-পূজা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী, পৌষী পূর্ণিমায় মহালক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, ও গৃহ দেবতা ৺ মদনগোপালের দোলযাত্রা সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। ইহাতে যে সকল গণ্য মান্য পণ্ডিতগণ তাঁহার গৃহে পূজায় ব্রতী হইতেন, তাঁহারা উপবাস জনিত ক্লেশ অনুভব করিতেন না, কারণ কর্ম্মকর্ত্তাও স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনায় বা তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত। বাস্তবিক যদি কর্ম্মকর্ত্তা, পূজার দিবসে তাঁহার নিয়মিত সময়ের মধ্যে সুখে আহার করিয়া অন্তঃপুরে আরাম করিতে থাকেন, আর অর্থলোভে পূজক মহাশয় অনাহারে, বাটীর এক প্রান্তে শুষ্কমুখে পড়িয়া থাকেন, সে পূজাতে যতই অর্থ ব্যয় হউক না কেন, উহা কদাচ সাত্ত্বিক পূজা

বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। এবম্বিধ পূজায় আর নবীনচন্দ্রের পূজায় অনেক প্রভেদ। নবীনচন্দ্র অল্পায়াসে বা বহুকষ্টে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতেন, স্বয়ং উপবাসী ও সংযমী থাকিয়া গভীর ভক্তিযোগে ও করযোড়ে নারায়ণে অর্পণ করিতেন। নারায়ণ যেখানেই থাকুন না কেন তিনি নিশ্চয়ই মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ভক্ত চূড়ামণি নবীনের পূজা গ্রহণ করিতেন, আর বৎসর বৎসর নবীন ঐরূপ ভক্তিভাবে পূজা করেন উহা আকাঙ্ক্ষা করিতেন, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। তিনি ভক্তের বাসনা পূরণকারী। নবীনচন্দ্র পূজোপলক্ষে উপবাসী থাকিলে তাঁহার আকার প্রকারে কেহ অনুভব করিতে পারিতেন না। আমি তাঁহাকে তিন দিবস নিরম্বু উপবাসী থাকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু একদিনও কাতর দেখি নাই। নবীন তৈল মর্দ্দন করিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত তিনি এইমাত্র সতৈল স্নান করিয়া আসিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সদাচারপূত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া গ্রামস্থ নানা দেবদেবীকে প্রণাম করিয়া বেড়াইতেন, তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে

বেলা ৮টার সময় স্নান করিয়া আহ্নিক ও পূজা করিতে বসিতেন। সহস্র কর্ম্ম এক দিকে, আর যথা সময়ে পূজা ও আহ্নিক অপর দিকে। বেলা ৮টার সময় পূজায় বসিয়া ১২টা পর্য্যন্ত নবীনচন্দ্র পূজা করিতেন। তিনি যে গৃহে পূজা করিতেন, সে গৃহে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতে ভাল বাসিতেন না। বিষয় কার্য্যানুরোধে কেহ তাঁহাকে ঐ সময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার বিরক্তির সীমা থাকিত না। পূজা সমাপনান্তে বাটীর সদর দ্বারে বসিতেন ও অতিথিদিগের আহারের ব্যবস্থা করিতেন। অতিথি সৎকারে তিনি বড় তৃপ্ত হইতেন। শীতকালে বিস্তর অতিথি গঙ্গাসাগর তীর্থে গমন করে। তাহাদের পদব্রজে যাইবার একমাত্র পথ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। নবীনের বাটী ঐ পথের ধারে ; আর বহুপূর্ব্ব হইতে নবীনের বাটীতে অতিথি সেবা হয় এই খ্যাতি থাকায় তাঁহার বাটীতে সময়ে সময়ে একশত লোকেরও অধিক ব্যক্তি সমাগত হইত। তাহাদের কেবলমাত্র আহারের সামগ্রী দিলে নিস্তার ছিল না। শীতকালে তাহাদের ধুনির জন্য শুষ্ককাষ্ঠ, গাঁজা, সিদ্ধি ও সময়ে সময়ে গাত্রবস্ত্র

পর্য্যন্ত দিতে হইত। নবীন যখন দেখিতেন যে অভুক্ত কেহ নাই, তিনি স্বীয় গৃহদেবতা ৺মদন-গোপাল ঠাকুরের প্রসাদ আহার করিতেন। নবীনের বাটীর উত্তরাংশে কালীদেবীর দালান ও দক্ষিণাংশে ৺মদনগোপাল ঠাকুরের বিগ্রহ স্থাপিত। কতদিন পূর্ব্বে ঐ বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা যায় না। স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যখন প্রথম শিমুলগড়ে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন তখন ঐ বিগ্রহ তাঁহার সঙ্গে থাকিলেও থাকিতে পারে। নবীনের বাটীর বিধবা স্ত্রীলোকগণ ও নিরামিষভোজী ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণ উক্ত ঠাকুরের প্রসাদভোগী। নবীন এই প্রকারে মধ্যাহ্নে, আতপ তণ্ডুলের সামান্য অন্ন, ঘৃতসৈন্ধবাদি দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন ও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আহার করিতেন ও রাত্রে কোন কোন দিবস যৎসামান্য দুগ্ধপান করিতেন। দারুণ গ্রীষ্মেও নবীনচন্দ্রকে কখন আহারের সময় ব্যতীত জলপান করিতে দেখা যায় নাই।

নবীনের অতিথিদিগের প্রতি যেমন যত্ন ছিল, অনুজীবীদিগের প্রতি ততোধিক স্নেহ ছিল। কোন ভৃত্যের পীড়া হইলে তাহার জন্য দুগ্ধ, সাগু ও

ঔষধ যথাসময়ে ব্যবস্থা না করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না। ভৃত্যেরাও নিতান্ত প্রভুপরায়ণ ছিল। নবীনের দেহত্যাগের দিবস তাঁহার আত্মীয়স্বজনাপেক্ষা তাঁহার ভৃত্যবর্গকে অধিক কাতর দেখা গিয়াছে।

নবীনচন্দ্র প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় শাস্ত্রালোচনায় বসিতেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস হয় নাই। বৈকাল তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ও কখন কখন রাত্রিতে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনার ভাবে স্পষ্ট প্রকাশ পাইত, যে তিনি একান্ত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ ছিলেন। কর্ম্মতত্ত্ব, দৈবতত্ত্ব, পুরুষকার এবম্বিধ বিষয়ের তর্কস্থলে তিনি প্রায়ই নিরপেক্ষ থাকিতেন। তিনি বলিতেন যে দুরূহ বিষয়ের তর্কে জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা শ্রদ্ধাবান হইয়া কর্ম্ম করা শ্রেয়ঃ ও তৃপ্তিদায়ক। তবে তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ঘোর বিশ্বাস ছিল। কর্ম্মের প্রাধান্য তাঁহার সর্ব্বথা শিরোধার্য্য ছিল। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে তিনি পুরুষকারকে গুরু ও দৈবকে শিষ্য বলিয়া সম্বোধন

করিতেন। তিনি দৈবের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন না। যাহার কর্ম্মে চেষ্টা আছে দৈব তাহার সহায় হয়।

মূলধন এক, তবে ইহ সংসারে পরস্পরের মধ্যে ভিন্নাবস্থা কেন? ব্যবসায়ীর যত্নের উৎপত্তি কোথায়? এই স্বতন্ত্র প্রশ্ন উঠিলে তিনি বলিতেন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বিষম গোলের কথা উঠে। সকলি ভগবল্লীলা এই এক কথায় পণ্ডিতগণ, ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মত লোকের "ভগবল্লীলা" শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। "ভগবল্লীলা" হয়ত ভক্ত প্রধান নারদ বহু পুণ্যবলে বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "লীলা" একটী অদ্ভুত শব্দ। জগতের অপর কোন ভাষায় ইহার প্রতিবাক্য নাই। যুগ যুগান্তর গভীর চিন্তা করিয়া ঋষিগণ হয়ত "লীলা" শব্দের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। "ভগবল্লীলা" শীর্ষক যে একটী সামান্য কবিতা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাই নবীন-চন্দ্রের ভগবল্লীলা বুঝিবার প্রার্থনা।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভার হরণায় মে।
সংরক্ষণায় সাধুনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায় চ ॥৯॥
অন্যোঽপি ধর্ম্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংশ্রিয়তে ময়া।
বিরামায়াপ্যধর্ম্মস্য কালে প্রভবতঃ ক্বচিৎ ॥১০॥

টীকাকার "অয়ং অবতারঃ" ইহার অর্থ "এতাদৃশ লীলা মানুষাবতারঃ"। লিখিয়া গিয়াছেন। স্বতন্ত্র স্থলে "লীলয়া" অর্থে "স্বকৃতৈঃ মৎস্যাদ্যাবতারৈর্দ্দেবান্" লিখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এ কথা উঠিতে পারে প্রত্যেক জীব, যে যাহা করিতেছে, ইহাও ত সেই নারায়ণের কার্য্য। অর্জ্জুনাদি যে পাপীগণের বধ করিয়াছিলেন ও যুধিষ্ঠিরাদি যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও ত সেই নারায়ণেরই কার্য্য। প্রত্যেক জীবের অন্তরে যে শক্তি আছে, ইহাও ত সেই মহাশক্তির অংশ। এই একই শক্তি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বিরাজিত হইয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে কার্য্য করিতেছে ও অহর্নিশ অধর্ম্মের দমন ও ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া নারায়ণের অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেছে। আমরা নিত্য যে ধার্ম্মিকগণের শ্রীবৃদ্ধি ও অধার্ম্মিকগণের পতন প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহাও সেই নারায়ণের লীলা।

তবে আবার কালে কালে, যুগে যুগে, শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণাদি বর্ণে রূপধারণ করিয়া লীলা দেখাইবার প্রয়োজন কি? প্রত্যুত্তরে যদি বলা যায় যে নারায়ণের পূর্ণাংশে দেহধারণ ব্যতীত বিশেষ কীর্ত্তি স্থাপনা করা যায় না, অথবা ধর্ম্মের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হয় না, তাহা হইলে অপর দিকে তর্ক উঠিতে পারে যে ভগবানের পূর্ণাংশের বীর্য্য দেখাইতে পরম অধার্ম্মিকেরও সৃষ্টি করিতে হয়, অর্থাৎ রাবণ, শিশুপালাদির সৃষ্টি করিতে হয়, এবং তাহাদের জনিত অত্যাচারেরও সৃষ্টি করিতে হয়। এ তর্ক উঠিলে অবতারবাদ স্থাপনার জন্য বলিতে হয় যে যুগে যুগে অবতারের আবির্ভাব, সৃষ্টির একটী অঙ্গবিশেষ বা বিশ্বস্রষ্টার লীলা। কল্পান্তে, প্রত্যেক আদি সৃষ্টির যুগে যুগে, এ লীলা দর্শিত হইবে। এই সকল কারণে নবীনচন্দ্র বলিতেন "লীলা" শব্দ ঋষিদিগের কল্পিত এক অদ্ভুত শব্দ। তিনি আরো বলিতেন যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সকলই ভগবল্লীলা, এ লীলা বুঝা ভার। আর এক মত আছে যে অবতারগণের কার্য্যে আর মানবের কার্য্যে প্রভেদ আছে। অবতারগণ কর্ম্মে নির্লিপ্ত ও মানবগণ

কর্ম্মে লিপ্ত। সুতরাং মানবের কার্য্যকে ঈশ্বর-লীলা বলা যায় না।

নবীনচন্দ্রের অবসর সময় মনুসংহিতা ও কয়েকখানি উপনিষৎ পাঠে অতিবাহিত হইত। আর যে চির পবিত্র ভগবদগীতা আজকাল সকল সম্প্রদায়ের আদরের পুস্তক হইয়াছে, অপরাপর গ্রন্থের সহিত সেই গীতাগ্রন্থ নবীনচন্দ্র একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসরকাল পরম ভক্তিসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গীতাগ্রন্থ তাঁহার একান্ত ভক্তির সামগ্রী ছিল, এই হেতু রোগ ও শব শয্যায় তাঁহার শিরোদেশে গীতাগ্রন্থ রাখা হইয়াছিল ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্তে উহা নবীনের ভস্মের সহিত পুণ্য সলিলা ভাগীরথী বক্ষে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বৎসর বৎসর স্বগৃহে নবগ্রহের হোম করাইতেন ও পুত্র কন্যাগণের যোটক গণনা না করাইয়া বিবাহ দিতেন না। কোন স্থানে যাইতে হইলে অশুভ দিনে বাটী হইতে যাইতেন না ও তিথি বিচারপূর্ব্বক ফল শস্যাদি আহার করিতেন। জন্ম, মৃত্যু ও

বিবাহের কাল ও অপরাপর জীবনযাত্রার ঘটনা চির-নির্দ্দিষ্ট বা অস্থির ও তাহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা কতদূর জ্ঞাত হওয়া যায়, এই বিষয় অবলম্বন করিয়া অনেক সময়ে অনেক লোকের তাঁহার সম্মুখে অনেক তর্ক বিতর্কের কথা আমি শুনিয়াছি। অনেক জ্যোতিষীকেও অতীত ঘটনা ও কখন কখন ভবিষ্যৎ ঘটনা যথাযথ গণনার দ্বারা বলিতেও শুনিয়াছি। এ সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে "এতাদৃশ দুরূহ বিষয়ে মতামত দিবার আমার শক্তি নাই; তবে আমার বিশ্বাস যে মানবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মবলে ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন ব্যক্তির উৎকট রোগে যে ঔষধ প্রয়োগ বা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা শুভফল হয়, তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল বশতঃ স্থির আছে। ইহজন্মে কর্ম্মে একান্ত প্রবৃত্তি, যত্ন ও শুভফল যেমন জন্মান্তরের কর্ম্মের হেতু, রোগনির্ণয়, উপযুক্ত চিকিৎসা বা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির আয়োজনও তদ্রূপ। যেমন যুগে যুগে রাম, কৃষ্ণাদির জন্ম স্থির আছে, সেইরূপ প্রত্যেক মানবও স্বকর্ম্ম লইয়া সৃষ্টিচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এ চক্রের আদি, অন্ত, নাই

কিন্তু মধ্য আছে; উহাই বিষ্ণু চক্র; শ্রীকৃষ্ণ ঐ চক্রের মধ্যে।

নবীনচন্দ্রের অনেক জ্ঞানী লোকের সহিত বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী যখন হুগলীতে আগমন করেন তখন তাঁহার সহিত নবীনচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়, আর যতদিন তিনি হুগলীতে ছিলেন নবীন তাঁহার নিত্য সহচর ছিলেন, সুতরাং উভয়ের নিরতিশয় সখ্য জন্মে। ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাস নির্ব্বিচারে তিনি গুণের ও জ্ঞানের আদর করিতেন। দয়ানন্দের উপদেশানুযায়ী নবীনচন্দ্র কিছুদিন মধ্যাহ্ন অন্নাহারের পূর্ব্বে হোম করিতেন। সেই হোমের ব্যবস্থা দয়ানন্দের স্বহস্ত লিখিত ছিল। নবীন তাহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দু দেবদেবীর পূজার বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে তিনি বেদবিহিত হোমাদি কার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। দয়ানন্দ, নবীনচন্দ্রের সাময়িক বন্ধু হইলেও তাঁহার দেবদেবীর পূজায় যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ছিল, তাহা দয়ানন্দের পরামর্শে কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই।

দেবদেবীর বিশেষতঃ দুর্গা ও কালী পূজা কি কারণে শ্রেষ্ঠ, নবীনচন্দ্র তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকটে এক দিবস বলিতেছিলেন। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত হেতুবাদ আমার স্মরণ নাই, যাহা স্মরণ আছে, নিম্নে তাহার মর্ম্ম সন্নিবিষ্ট করিতে সাহসী হইলাম। তিনি একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন না। জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্যে দুর্গা ও কালী পূজা সম্বন্ধে তাঁহার যে নিজস্ব ধারণা ছিল তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিতে বাধ্য হইলাম।

কৃষ্ণা ও পার্ব্বতী একই নির্ব্বিশেষ শক্তি। কালী দুর্গা একই মহাশক্তির অংশ বিশেষ। দুর্গা, কালীরূপ নির্ম্মোচন করিয়া গৌরবর্ণারূপে আবির্ভূতা হয়েন। যিনি কেবল দুর্গামূর্ত্তি পূজা করেন তিনি কেবল মহাশক্তির একাংশমাত্র পূজা করেন, সে শক্তির অপরাংশ পূজা না করিলে পূজা অসম্পূর্ণ হয়। এই জন্য অস্মদ্দেশে চির প্রথা আছে, যে সাধক দুর্গা পূজা করিয়া তৎপরে মহা অমারজনীতে কালী পূজা না করিলে দুর্গা পূজার পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়েন না। দেবাসুরের সংগ্রাম জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে অহোরাত্র হইতেছে। জীবন্ত সকল দেহীর অন্তরেও

এই সংগ্রাম সর্ব্বক্ষণ চলিতেছে। দ্বিতীয় মন্বন্তরেই হউক, ত্রেতায়, দ্বাপরে, কলিযুগে বা যে কোন যুগেই হউক এই দেবাসুরের সংগ্রামের বিরাম নাই। দ্বিতীয় মন্বন্তরে যখন পার্ব্বতীর অসামান্য রূপ সৌন্দর্য্য চণ্ডমুণ্ড প্রমুখাৎ অবগত হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের পার্ব্বতীহরণের বাসনা জাগ্রত হয় বা জনক দুহিতা সীতাদেবীর অলোকসামান্যারূপরাশি দর্শনে রাক্ষস রাবণের সীতাহরণের লালসা জন্মে, বা লুব্ধ দুর্য্যোধনের, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব গ্রাসের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় অথবা রাজপুত্র প্যারিস স্পার্টার মিনিল-সের পরমাসুন্দরী জগদ্বিখ্যাতা হেলেনকে গোপনে হরণ করিয়া আতিথ্য ধর্ম্মের অবমাননা করে তত্তৎ-কালেই সেই মহাশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় ও পাপের ধ্বংসের জন্য জগদম্বা বা নারায়ণ সর্ব্বপাপ সংহারিণী চামুণ্ডামূর্ত্তি বা ভুবনমোহনরূপী শ্রীরাম-চন্দ্রমূর্ত্তি বা বাসুদেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সংসারে ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন। এই শক্তি পুরাকালে একদা কোন ঋষি কন্যায় আবির্ভূতা হইয়া বলিয়া-ছিলেন আমিই একাদশ রুদ্র, আমিই বসু, আমিই দ্বাদশ আদিত্য, আমিই আত্মা, আমিই ইন্দ্র,

আমিই অগ্নি, আমিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, আমি উপাসকগণের শুভফলদাত্রী ইত্যাদি।

দুর্গামূর্ত্তি এই মহাশক্তির একাংশ আর কালী-দেবী এই শক্তির অপরাংশ। ঋষিগণ একই শক্তিকে লোকহিতচ্ছলে দুই অংশে দেখাইয়া গিয়াছেন। সুখ, সম্পদ, ধন, বিদ্যা, সিদ্ধি, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি যে শক্তি হইতে উদ্ভূত সেই শক্তি হইতেই মহামারি, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, যুদ্ধ ইত্যাদির সৃষ্টি। গৌরবর্ণা, শান্তমূর্ত্তি দুর্গাদেবীর লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক অনুচর আর সেই শক্তিই কালীরূপে নরমুণ্ড, নরহস্তাদি ভূষণে সজ্জিত হইয়া জিহ্বাব্যাদনপূর্ব্বক শ্মশানে ঘোর তমসাবৃত রজনীতে বিরাজ করেন। সুতরাং সাধ-কের দুই শক্তিকেই আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র এক শক্তির অংশ বিশেষকে পূজা করিলে পূজার সম্পূর্ণতা বা সাফল্য হয় না। গৌরবর্ণা দুর্গাদেবী স্বমূর্ত্তিতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উপাসকগণকে দেখাইতেছেন যে দশ হস্তে অস্ত্র-ধারণ করিয়া অসুরকে দমন করিতে পারিলে লক্ষ্মী, সরস্বতীর ন্যায় কন্যারত্ন ও গণেশের ও ষড়াননের

ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ হইবে। অর্থাৎ মা ভগবতীর কৃপায় দশেন্দ্রিয়কে সংযম করিয়া অসুররূপী দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিলে পার্থিব সম্পদের সীমা থাকিবে না, কারণ মা ভগবতী দুর্গতিহারিণী ও সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়িনী। আর অসৎপ্রবৃত্তি পোষণ করিলে ভয়ঙ্করা কালীদেবী স্বহস্তে পাপীর মুণ্ড, হস্তপদাদি ছেদন করিয়া তাহার শোণিত পরমাহ্লাদে পান করিবেন ও ছিন্নমুণ্ডে, ছিন্ন হস্তপদাদিতে সজ্জিত হইয়া ঘোর তমসাবৃত রজনীতে পাপজীবনের যাহা কিছু প্রিয় তাহা স্বপদে দলিত করিয়া নৃত্য করিতে থাকিবেন। সংসারে সকল জীবের অন্তরে ধর্ম্ম ও পাপ বৃত্তির কলহ অবিরত হইতেছে। দশেন্দ্রিয়কে সংযম করিতে না পারিলে রিপু পরতন্ত্র হইয়া জীবমাত্রেই কখন পাপ করে, কখন পাপ হইতে বিমুখ হয়। যখন পাপ প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তখন অসুরের জয় হয় ও অসুর দুর্গা দেবীকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কালীরূপে নরমুণ্ডে সজ্জিত হইয়া শৃগাল কুক্কুরে পরিবৃত হইয়া সংসারে আতঙ্ক পূর্ণ করে। পাপী চারিদিক তমসাচ্ছন্ন দেখে আর মা ভগবতীর কৃপায় পাপ

করিতে বিরত হইলে সুখের ও স্বচ্ছন্দের সীমা থাকে না, সাধক সকল সম্পদ প্রাপ্ত হন। ভক্তবৃন্দ, কালীদেবীর শাসন সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া, যেন মা ভগবতীর পূজা করেন। দশেন্দ্রিয়কে সংযম করিয়া পাপে বিরত হইলে সুখ সম্পদ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া যখন নবীনচন্দ্র স্বগৃহে বিশ্বসংসারের আধাররূপিণী মা ভগবতীর ও শ্মশানবাসিনী মা কালীর স্বগৃহে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া আরাধনা করিতেন সে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। বলা বাহুল্য সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী মা ভগবতী ও কালীদেবী, নবীনচন্দ্রের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অসুর বৃত্তির লেশমাত্র ছিল না।

নবীনচন্দ্রের জবা, তগর, দ্রোণ, করবী প্রভৃতি পুষ্প বড় প্রিয় ছিল। তাঁহার পিতামহের নির্ম্মিত দালানের সিড়ির দুই পার্শ্বে দুইটী করবীর বৃক্ষ ছিল, সেই দুইটী করবীর বৃক্ষে তাঁহার সাতিশয় যত্ন ছিল। আর গৃহের সান্নিধ্যে একটু পরিষ্কার স্থান পাইলেই ঐ সকল বৃক্ষ যাহাতে রোপিত হয়, তৎপক্ষে বড় চেষ্টা ছিল। ভক্তবৃন্দ সকলেই অবগত আছেন, যে

উপর্য্যুক্ত পুষ্পগুলি সাধকের পক্ষে বড় প্রিয় পুষ্প। কেন যে ঐ পুষ্পগুলি প্রিয় পুষ্প ছিল, তাহার কারণ নবীনের অসীম আন্তরিক পবিত্রতা। আর ঐ সকল পুষ্পগুলি পবিত্র। যাঁহাদের অন্তঃ পবিত্র আত্মা তাঁহাদের পক্ষে অন্তঃ পবিত্রাত্মক বিষয়ই বিশেষ প্রীতিকর হয়। ভোগানুরাগীর পক্ষে গোলাপ, জাঁতি, যুথী প্রভৃতি রজো ও তমোমূলক পুষ্প সকল প্রিয়, আর অন্তর্বিরাগীর পক্ষে জবা, তগর, অপরাজিতা প্রিয়। নবীনচন্দ্র অন্তঃ বিরাগী পুরুষ ছিলেন, সেই জন্যই তিনি ঐ সকল পুষ্প বড় ভালবাসিতেন।

নবীনের এই অগাধ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যে জন্মসিদ্ধ তাহা জ্যোতিষজ্ঞ মাত্রেই তাঁহার জাতচক্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এই হেতু আমি নিম্নে তাঁহার জাতচক্র উদ্ধৃত করিলাম। ইহার বিচার করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে এই প্রস্তাবে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লেখা হইল তাহার এক বর্ণও অত্যুক্তি নহে।
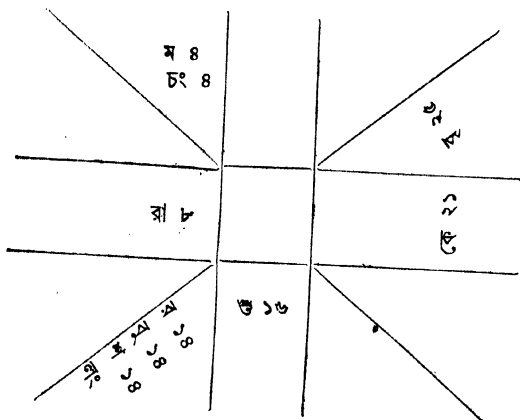
পাঠক! স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন যে ধর্ম্মাধিপতি শুভগ্রহ শুক্র ও বৃহস্পতি ধর্ম্মস্থান অবলোকন করায় ও পূর্ণবলী চন্দ্র ধর্ম্মস্থানে অবস্থিতি হেতু জাতকের অসীম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জ্যোতিষশাস্ত্র-সম্মত।

নবীনের অন্তর্বাহ্য দোষ ছিল না। যাহা তাঁহার অন্তরে থাকিত, যাহা সত্য, সর্ব্ব সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। বিষয়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, কিঞ্চিৎ লভ্যের বা অপর কোন কারণে, তিনি কাহারও সহিত প্রবঞ্চনা করিতেন না। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটি-

য়াছে যে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ মিথ্যা বাক্যে বৈষয়িক কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে আর দৈবক্রমে তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু শুভফল হইত। সত্যের ও সততার ফল নিরন্তর মঙ্গল বিধায়ক। যাঁহারা তাঁহার সহিত একবার মাত্র কথোপকথন করিতেন তাঁহারা তাঁহাকে ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার আকারের যে এক অনির্ব্বচনীয় বিশেষত্ব ছিল, তাহাতে দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহাকে সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিত।

নবীনচন্দ্রের পরিচ্ছদের আদৌ পারিপাট্য ছিল না। গৃহে যে পরিচ্ছদ নিত্য পরিধান করিতেন, কোন স্থানে যাইতে হইলে উহা পরিবর্ত্তন করিতেন না। বাহ্যাড়ম্বর তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তবে সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ নিয়ম ছিল। আপন পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে যেমন সংযমিতা ছিল, পুত্রগণকেও সেইরূপ অভ্যাস করাইতেন। তিনি স্নেহ-দুর্ব্বল পিতা ছিলেন না।

তাহাদিগকে তিনি কখন চুলের পারিপাট্য বা অবস্থার অসামঞ্জস্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিতেন না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ও প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের যজ্ঞোপবীতার সময় অনেক দীন, দরিদ্র ব্যক্তিগণকে অন্ন ও কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু যজ্ঞোপবীতার আনুসঙ্গিক সমাবর্ত্তনের জন্য অতি অল্প মূল্যের বস্ত্রাদি ক্রয় করায় বালকগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরার ও গৃহের অপরাপর স্ত্রীলোকগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও ঐ দ্রব্যগুলি পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি বলিতেন যে উত্তম পরিচ্ছদ সমাবর্ত্তনের অঙ্গ বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রথানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের কাল সমাপ্ত হইতে না হইতেই সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে। তিন দিবসের মধ্যেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যের কাল সমাপ্ত হইয়া সমার্ত্তন হয়। এক্ষণে যে বয়সে ব্রাহ্মণ বালকের যজ্ঞোপবীত হয়, সেই বয়স হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপযুক্ত কাল। নবমবর্ষে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত পক্ষে বিংশতি বৎসরাবধি কতকটা ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন করা যুক্তিযুক্ত। নবমবর্ষে বা কখন কখন তৎপূর্ব্বেই বালকগণের ভোগবাসনার

সূত্রপাত হইতে থাকে। ঐ সময় যদি কথঞ্চিৎ সংযমন শিক্ষা দেওয়া যায় ও বিংশতি বৎসরাবধি যদি বালকের গুরু ও আচার্য্যস্থানীয় পিতা, মাতা, বা নিকট আত্মীয়গণ, বালককে যথাসম্ভব শাসনে রাখিতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ সৌখীন বসন ভূষণাদি ধারণ, গন্ধদ্রব্য লেপন, মাংসাদি ভোজন হইতে বিরত রাখেন, তাহা হইলে বালকের হিতসাধন করা হয় ও তাহার চরিত্রের সুগঠন অনেকটা আশা করা যায়। বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিলে ও কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপার্জ্জন হইলে বালকের নিজের রুচির বা প্রবৃত্তির উপর ছাড়িয়া দেওয়ায় ক্ষতি নাই। একাদিক্রমে দশবৎসর সংযমন শিক্ষা করিলে এক প্রকার সংস্কার প্রভাবে বালকের সকল দিকেই সুপ্রবৃত্তি হয় ও আজীবন সুখী হইতে পারে।

পুরুষের বিবাহের কাল সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে যেমন অনেক কথা বলিবার আছে, সাপক্ষেও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। অপরিপক্ক বয়সে সন্তানোৎপাদন, ও তাহাদের লালন পালনের ভার যেমন কষ্টপ্রদ ও বিদ্যাশিক্ষার বিঘ্নকারক, অধিক বয়সে বিবাহ

তেমনি উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ও স্থল বিশেষে উৎকট পাপের পোষক। উভয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিংশতি বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই পুরুষের বিবাহ দিবার উপযুক্ত কাল, ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল। তাঁহার পুত্রগণের প্রায় ঐ সময়েই বিবাহ দিয়াছিলেন ও তাহাদের বিবাহে কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।

কন্যা ও বধূগণ নিত্য শিব পূজা না করিলে তাহাদের জলগ্রহণ করিতে দিতেন না, আর গৃহদেবতা ৺মদনগোপাল ঠাকুরের পূজার পুষ্প-পাত্র ও নৈবেদ্য প্রস্তুত না করিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন।

নবীনচন্দ্র অতি-ভোজন দোষাবহ ইহা পরি-বারস্থ বালকদিগের নিত্য বলিতেন। উদরিক ব্রাহ্মণ কোন পুণ্য কর্ম্মে অধিকারী হয় না, সে নিরন্তর আহারের চেষ্টায় থাকে। পরিমিত ভোক্তাকে প্রায় রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না ও সে দীর্ঘায়ু হয়। এই কারণে তিনি বালকগণের আহারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

বাটীর পরিবারবর্গকে তিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন নিত্য তিলপ্রমাণ সঞ্চয় করিবে, আর সৎকর্ম্মে অকাতরে ব্যয় করিবে। কোথাও দুইটী চাউল পড়িয়া থাকিলে তিনি স্বয়ং এক-একটী করিয়া সংগ্রহ করিয়া কাহারও হস্তে ভাণ্ডারে রাখিবার জন্য দিতেন, কিন্তু যাহার হস্তে দিতেন সে প্রায় গোপনে তদ্দণ্ডেই উহা ফেলিয়া দিত। এদিকে পূজাদি ক্রিয়াকলাপে তাঁহার ব্যয়ের সীমা থাকিত না। কি প্রকারে ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবে তজ্জন্য বড় ব্যস্ত। যাহারা তাঁহার সঞ্চিত দুইটী চাউল তাঁহার অসাক্ষাতে ফেলিয়া দিত তাহারাই তাঁহার প্রভূত ব্যয়ের জন্য অসন্তুষ্ট হইত। ক্রিয়াকলাপে তিনি যেমন পর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিতেন, সুবন্দোবস্তের জন্যও সর্ব্বান্তঃ-করণে তেমনি চেষ্টা করিতেন। তিনি স্বয়ং প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ও অতিথির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের আহার্য্য সামগ্রীর কোন অপ্রতুল আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন আর তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণ সকলেই স্বহস্তে পরম যত্নে পরিবেষণ করিত, সুতরাং ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত।

নবীনচন্দ্রের দানশক্তি ক্ষমতানুযায়ী ছিল। অন্ন-দানে তিনি কদাচ কাতর হইতেন না। অভুক্ত ব্যক্তিকে আহার না করাইয়া তিনি কখন আহার করিতেন না। সৎপাত্রে দানও বিলক্ষণ ছিল, তবে তিনি দান করিয়া প্রকাশ করা দূরে থাকুক পুত্র কন্যাগণকেও বলিতেন না। তিনি বিদ্যা-র্থীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তাঁহার পুত্র-দিগের সহিত সমান যত্নে অনেকগুলি বালককে তাঁহার হুগলীর বাটীতে প্রতিপালন করিয়াছিলেন ও তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার যাবৎ ব্যয় বহু বৎসর পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। তম্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এক্ষণে সম্মানের সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

নবীনচন্দ্রের সংসারে মায়া সাধারণ ব্যক্তির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম ছিল। তিনি সংসারে লিপ্ত থাকিতেন বটে, কিন্তু যেন ভাসা ভাসা রকমের, যেন পদ্মপত্রে জলের মত; জল পদ্মপত্রে লাগিয়া রহিয়াছে অথচ তাহাতে প্রবেশ করে নাই। পুত্র পৌত্রাদির সহিত তাদৃশ একটা মাখামাখি সম্বন্ধ তাঁহার ছিল না, অথচ তাহাদের বিদ্যা

শিক্ষা দেওয়া বা কাহারও পীড়া হইলে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত অতি পরিপাটি ছিল। নবীনের ভোগাভিলাষ ছিল না। অর্থশালী হইলে ভোগ লালসা বলবতী হয়, কিন্তু নবীনচন্দ্রের আহার্য্য কোন্ দ্রব্য যে প্রিয় ছিল তাহা কেহ বলিতে পারিত না। ব্যঞ্জন অলবণ হইলে, অন্ন সুসিদ্ধ না হইলে বা আহার্য্য সামগ্রীতে কোন দোষ হইলে তাঁহাকে কেহ বিরক্ত হইতে দেখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সকল দ্রব্যই উত্তম হইয়াছে বলিতেন। বাটীতে ক্রিয়াকর্ম্মে বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করাইতেন, কিন্তু স্বয়ং কোন দ্রব্যই খাইতেন না। কদাচ কোন দ্রব্য অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। মিষ্টান্ন অপেক্ষা দেশীয় ফল পসন্দ করিতেন। তবে একটী কথা না বলিলে মিথ্যা বলা হয় তিনি বড় বেল ফলের প্রিয় ছিলেন। তিনি বহুদিন উদরাময় রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন কাঁচা বা পাকা বেল না পাইলে তাঁহার কষ্ট হইত।

নবীনচন্দ্র অসৎ বিষয়ে যেরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন, সৎবিষয়ে সেইরূপ আদর করিতেন।

তিনি একান্ত সত্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার মত লোক যদি সত্যপ্রিয় না হইবে তবে সত্য আর কাহাকে আশ্রয় করিবে? সত্য নিষ্ঠা ও অঙ্গীকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান ধর্ম্মের একটী বিশেষ অঙ্গ ইহা তিনি সতত বলিতেন। তাঁহার, বঞ্চকদিগের মিথ্যা কথা বুঝিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। রচনা সংক্ষেপ উদ্দেশে আমি ইহার একটী মাত্র উদাহরণ দিব। এক দিবস নৌকাযোগে তিনি তাঁহার হুগলীর গঙ্গাতীরের বাটী হইতে চন্দননগরে বেড়াইতে যান। তথায় এক দোকানে ভাল চাউল পরিবারবর্গের জন্য মনোনীত করিয়া আসেন। পরদিবস তাঁহার কোন ভৃত্যকে ঐ দোকানের বৃত্তান্ত বলিয়া দিয়া চাউল ক্রয় করিবার জন্য পাঠান। তখন গ্রীষ্মকাল, ভৃত্যটি বেলা ৯টার মধ্যে আহার করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যায়। সায়াহ্নে নবীনচন্দ্র আহ্নিক করিবার জন্য বস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন এমন সময়ে ঐ ব্যক্তি শুষ্ক মুখে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে নমুনার মত চাউল পাওয়া যায় নাই। ভৃত্যটি কথা কহিতে না কহিতেই নবীনচন্দ্র সাতিশয় রাগান্বিত হইলেন। ক্রমাগত বলেন ঐ ব্যক্তি

কখন চন্দননগরে যায় নাই। তাহার সমস্ত কথা অলীক। নবীনের পুত্রেরা এইপ্রকার আচরণে বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল যে ঐ ব্যক্তি এই দারুণ রৌদ্রে সমস্ত দিন ঘুরিয়া আসিল আর আপনি উহাকে বাটী ফিরিতে না ফিরিতেই এত তিরস্কার করিতেছেন কেন? কাজেই তিনি নীরব হইলেন। এই ঘটনার দুই এক দিবস পরে ঐ ভৃত্যটি তাঁহার এক পুত্রকে গোপনে বলিয়াছিল যে বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, বাবু কি প্রকারে জানিতে পারিলেন যে আমি চন্দননগরে যাই নাই। অত্যন্ত রৌদ্র দেখিয়া আমি আহারান্তে নিকটের একটী দোকানে নিদ্রা গিয়াছিলাম, নিদ্রাভঙ্গে দেখি দিবা অবসান প্রায়, কাজেই বাটীতে ফিরিয়াছিলাম, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বাবু উপরে ছিলেন আমার মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই, কি প্রকারে জানিতে পারিলেন যে আমি চন্দননগর যাই নাই। সেই দিবস হইতে ভৃত্যটির প্রভুর প্রতি নিরতিশয় ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। ভৃত্য সম্বন্ধে প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়া নবীনচন্দ্রকে কেহ

সময়ান্তরে ঐ বিষয় অবগত করেন নাই, প্রকাশ করিবার আবশ্যকও হয় নাই। তাঁহার ক্রোধ যখন হইত তখনই প্রকাশ পাইত ও পরক্ষণেই ক্রোধের কারণ বিস্মৃত হইতেন।

নবীনচন্দ্রের কখন কখন ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রত্যক্ষী-ভূত হইত। এ সম্বন্ধে যে দুই একটী ঘটনা আমি অবগত আছি তাহা নিম্নে দিলাম। তিনি শিমুলগড়ের বাটীতে আছেন আর তাঁহার সন্তানেরা ও কতক পরিবারবর্গ তাঁহার হুগলীর বাটীতে আছেন। তাঁহার শিমুলগড়ের বাটীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার সন্তানেরা সকলেই শিমুলগড় যাইবার জন্য পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতে ব্যস্ত হইত। তাঁহার এক কন্যার হুগলীর অপর পারে নারায়ণপুর নামক গ্রামে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত গভর্ণমেণ্টের উকীল স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সেই কন্যা পূর্ণগর্ভাবস্থায় সহসা হুগলীর বাটীতে আসিয়াছিলেন। তখন দুর্গোৎসবের ৭।৮ দিবস বিলম্ব আছে মাত্র। পরিবারবর্গ সকলেই

শিমুলগড় যাইবার জন্ম ব্যস্ত। উক্ত কন্যাটিকেও তথায় লইয়া যাওয়া সকলের অভিপ্রায়। ইতঃ-মধ্যে শিমুলগড়ে নবীনচন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার বাটীর দালান হইতে জগদ্ধাত্রী দেবীকে অসময়ে নামান হইতেছে। পর দিবস তিনি হুগলীর বাটীতে আসেন ও তথায় আসিয়া দেখেন যে তাঁহার ঐ কন্যাটি বিনা আহ্বাহনে আসিয়াছে। পরিবারবর্গ সকলেই শিমুলগড় যাইবার জন্য ব্যস্ত। নবীনচন্দ্র এই অবস্থায় সে বৎসর হুগলীর বাটীস্থ কাহাকেও শিমুলগড়ে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন। পরিবারবর্গের মহা অসন্তোষ, সকলেই বিষণ্ণ। তিনি বলিলেন "কাহারও বাটী যাওয়া হইবে না। গৃহিনী শিমুলগড়ে আছেন, পূজার আয়োজনের কিছু মাত্র ত্রুটি হইবে না।" ইহার দুই চারি দিবস পরে কন্যাটি প্রসব হইল ও প্রসবান্তে উৎকট বিসূচিকা রোগা-ক্রান্ত হইল। পীড়ার সূত্রপাত হইতে না হইতেই নবীনচন্দ্র বলিলেন কন্যাটি বাঁচিবে না। তাঁহার স্বামীকে অবিলম্বে তারে সংবাদ দাও। বাটীর পরিবারবর্গের তাদৃশ উদ্বেগ নাই; তাঁহারা বলেন

সামান্য পীড়া, অনতিবিলম্বে উপশম হইবে। এদিকে দেখিতে দেখিতে রোগ বৃদ্ধি পাইল, রোগীর স্বামী সংবাদ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল ; সঙ্গে সঙ্গেই কন্যাটির দেহত্যাগ হইল। স্বামীর সহিত দেখা করিবার জন্যই যেন তাহার প্রাণ ছিল। অকালে নবীনের হৃদয়রূপ দালান হইতে জগদ্ধাত্রীকে নামান হইল। যখন বিপদ আসিয়া পড়ে তখন নবীনচন্দ্র আর অধীর নহেন। চক্ষে অশ্রু নাই, সকল বিষয়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইবে, কিসে সদ্যঃ প্রসূত শিশু রক্ষা পাইবে তৎপক্ষে চেষ্টাশীল। এই ঘটনার তিন মাস পরে শিশুটির পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। নবীন আজীবন বহুপ্রয়াসে ঐ পিতৃমাতৃ-হীনা দৌহিত্রীটিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কন্যা বিয়োগে বা জামাতা বিয়োগে নবীনের চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রুপাত হইতে দেখা যায় নাই, কিন্তু অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কন্যার মৃত্যুর তিন মাস পরে যখন তাঁহার জামাতার মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন, তিনি কেবলমাত্র এই কথা বলিয়াছিলেন যে "জগদীশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, আমার গায়ত্রীকে বৈধব্য

যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না বলিয়াই গায়ত্রী অগ্রে মরিয়াছে।" বিশ্ববিধাতা, যে সকল সময়েই জীবের মঙ্গল বিধান করিতেছেন এই অন্ধ বিশ্বাস হইতে নবীনচন্দ্রের মন কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইত না। ঈশ্বরে একান্ত শ্রদ্ধা মুক্তির কারণ।

বহু দিবস পরে নবীনচন্দ্রের তিন বৎসর বয়স্ক একটী পৌত্রের উৎকট বাতশ্লেষ্মার বিকার হয়। পীড়ার একচল্লিশ দিবসে বালকটীর সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে প্রাণবিয়োগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন কি উপযুক্ত চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন রোগীর আসন্ন মৃত্যু, আর এক দণ্ডকাল কাটিবে কি না সন্দেহ। নবীনচন্দ্র এই অবস্থায় তাঁহার বাটীর কালী দালানের বহির্ভাগে শয়ন করেন। সন্ধ্যা-কাল কাটিয়া গেল ও ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল; বালকের রোগ সমভাবে রহিল। রাত্রি ১০টার সময় সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। নবীনের সর্ব্বদেহ আর্দ্র হইয়া গেল তথাপি তিনি কালীদেবীর আশ্রয় ত্যাগ করিলেন না, প্রাতে উত্থান করিয়া বালকের পিতাকে অর্থাৎ তাঁহার পুত্রকে বলিলেন "তোমার পুত্র আরোগ্য হইবে। উহার

বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কালীকিঙ্কর নাম রাখিও।”

নবীনের ধর্ম্মবল পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অবিদিত ছিল না। সন ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের সময় তিনি তাঁহার কাছারি বাটীর সম্মুখে বসিয়া আছেন, ঐ বাটীর পরে গ্রাম্যপথ ও তৎপরে তাঁহার বাস্তু বাটী। ঐ বাটীর ত্রিতলের একাংশ ভগ্ন হইয়াছিল। নবীনের সহিত একত্রে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। যে ভূমিকম্পনের সূত্রপাত হইল সকলে ব্যস্ত সমস্তে উঠিয়া স্থানান্তরে দাঁড়াইল, নবীন কিন্তু সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে উঠিতে বলিতে লাগিল, তাহাদের ভয় পাছে ঐ ত্রিতলের ভগ্নাংশ তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সেই সময় একটী ভদ্রলোক তাঁহার আত্মীয়গণকে হাসিতে হাসিতে বলিল যে আপনারা কেন এত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন? আপনারা দেখুন না, যাবৎ ঐ ব্রাহ্মণ না উঠিবেন তাবৎ বাটী কখনই পড়িবে না। বাস্তবিক যেমন নবীনচন্দ্র ঐ স্থান হইতে

উঠিলেন, ক্ষণকাল মধ্যেই ভয়ানক শব্দে বাটীর ঐ অংশ পড়িয়া পর্ব্বত প্রমাণ স্তুপাকার হইল। সেই ভদ্রলোকটি তখন বলিলেন "কেমন আপনারা দেখিলেন আমার কথা সত্য না মিথ্যা, এমন লোকের যদি অপমৃত্যু ঘটে তবে কি আর পৃথিবী চলে ?

পূজা, পার্ব্বণ, আতিথেয়তা ও স্বজন প্রতি-পালনে নবীনের যৎসামান্য আয় ব্যয়িত হইত বলিয়া যে তিনি স্বদেশের উপকার সাধনে কিছু মাত্র ব্যয় করেন নাই বা যত্নশীল ছিলেন না তাহা নহে। তিনি একাদিক্রমে পঞ্চদশ বৎসর কাল উপর্য্যুপরি চেষ্টা করিয়া ও বহু অর্থ ব্যয়ে স্বগ্রামে রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপিত করেন। এই ষ্টেশনের যাবৎ ভূমি তিনি বিস্তর অর্থে ক্রয় করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে দান করেন। আর ঐ ষ্টেশন যাহাতে চিরস্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হয় সে জন্যও প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। গ্রামে একটী পোষ্টাপিষও স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ঐ ষ্টেশন ও পোষ্টাপিষে তাঁহার স্বগ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহাতে

গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে নিরন্তর ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। তবে তিনি তাদৃশ ধনবান ছিলেন না সুতরাং বিশেষ কীৰ্ত্তি রাখিয়া যান নাই। নবীনচন্দ্র স্বগ্রামের আর একটী উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রামে এক প্রকার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। মদ্যপান বা ব্যভিচার দোষের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় বিরক্তি থাকায় তাঁহার শাসনে গ্রামবাসী ও আত্মীয়গণ কেহই ঐ দোষে দূষিত হইতে পারিতেন না। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রাণপণে প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় এই সকল বিষয়ে তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না, কিন্তু গ্রামবাসীগণ স্বতঃই তাঁহার গুণানুকরণে যত্ন করিত।

একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেছি বলিয়া আমরণ সংসারে তাঁহার কখনও কাহার সহিত মনোমালিন্য হয় নাই, এ কথা লিখিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কখন কখন তাঁহার আত্মীয়গণেরও সহিত মনোমালিন্য হইয়াছিল। তবে নবীনচন্দ্রের সংসার অনেকটা সুখের সংসার ছিল।

ইহসংসার সর্ব্বথাই সুখ দুঃখে জড়িত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় দুঃখ ভোগও সংসারে প্রয়োজন। সংসারে দুঃখ না থাকিলে সুখের গৌরব বৃদ্ধি হইত না। নবীনের সংসারে দুঃখও ছিল সুখও ছিল। বিবাদও ছিল সম্প্রীতিও ছিল তবে দুঃখের ভাগ অপেক্ষা সুখের ভাগ অধিক ছিল, বিবাদ কদাচিৎ হইত।

শেষ জীবনে তিনি সংসারে শৃঙ্খলা রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু আয় বৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং আর্থিক অসচ্ছলতা হইবার সূচনা হইয়াছিল। সাধারণতঃ, অর্থ সংসারে একটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহাতে আত্মীয় পর হয় ও পর আত্মীয় হয়। ইহাতে স্ত্রী, পুত্রকে ভালবাসা দেখান যায় ও ইহার অভাবে উদার ও ধার্ম্মিক লোকও ঘৃণিত হইয়া পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে নবীনচন্দ্রকে আর্থিক কষ্ট পাইতে হয় নাই।

অর্থের মর্য্যাদা বুঝাইবার জন্য, গৃহে ধান্যস্থ লক্ষ্মী পূজার দিবস তিনি পরিবারস্থ সকল স্ত্রীলোকগণকে বলিতেন "ভাল করিয়া লক্ষ্মী পূজা

কর; লক্ষ্মী পূজায় শঙ্খধ্বনি ও ব্যঞ্জন পায়সাদির আয়োজন করিলেই লক্ষ্মীদেবীর সেবা করা হয় না; লক্ষ্মীকে একান্তমনে নিত্য যত্ন প্রয়োজন। যে সংসারের অন্তঃপুরবাসিনীগণ লক্ষ্মীকে যত্ন করিতে না জানে সে সংসারের পুরুষ যতই অর্থ অর্জ্জন করুন না কেন সে সংসারের শ্রেয়ঃ কদাচ হয় না।”

নবীনচন্দ্র মৃত্যুকালে চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ঐ দুর্ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি রক্তামাশয় রোগে মৃতপ্রায় হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য গমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু সংবাদে তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িবেন ইহাই তাঁহার আত্মীয়েরা অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ নিদারুণ সংবাদ পাইয়া কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হন নাই। অভ্যাস-যোগে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধাবস্থায় শ্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বস্তুতে একান্ত মন দিতে তিনি সক্ষম হইতেছিলেন। শ্রেয়ঃ পদার্থে মন দিবার শক্তি তাঁহার

দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়।

নবীন গৌরবর্ণের পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ললাট ও বক্ষ প্রশস্ত ও মুখমণ্ডল আনন্দময় অথচ গম্ভীর। তিনি দীর্ঘকার ছিলেন। চক্ষুদ্বয় বৃহৎ ও অপূর্ব্ব জ্যোতিঃবিশিষ্ট। মুখে যেন ধর্ম্মভাব লাগিয়া রহিয়াছে। মস্তকের সম্মুখের অংশে টাক ছিল। তাঁহার গতি নিতান্ত ধীর, দেখিলে বোধ হইত যেন বাল্যকালেও তাঁহার চাঞ্চল্য ছিল না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি সুঠাম। আর তিনি সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার আকার দৃষ্টে প্রকাশ পাইত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ৯ই শ্রাবণে নবীনচন্দ্র পিতৃদেবের বার্ষিক শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া রোগাক্রান্ত হন। সেই দিন হইতে তিনি আর অন্নাহার করেন নাই, কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি আহ্নিক করিতে বিরত হন নাই। ১৩ই শ্রাবণে তাঁহার জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মার যোগ হয় ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন, অগত্যা তাঁহাকে আহ্নিক বন্ধ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বদিনে শয়নাগারের এক স্থানে স্বহস্তে গঙ্গাজল

পূর্ণ পঞ্চপাত্রটি, পরিধেয় পট্টবস্ত্রখানি ও রুদ্রাক্ষের মালা ছড়াটি রাখিয়াছিলেন, ১৪ই তারিখে ক্রমে পীড়া কঠিন বলিয়া অনুভূত হয় ও উপযুক্ত ইংরাজি চিকিৎসকগণের হস্তে চিকিৎসা ভার ন্যস্ত হয়। ঐ দিবস তাঁহার পুত্র কন্যা ও জামাতাগণকে পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ দেওয়া হয় ও একে একে তাঁহারা সকলে সমবেত হন। ১৫ই শ্রাবণ সোমবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহসা তিনি কোন আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে বুধবার কবে? কেন যে বুধবারের অনুসন্ধান লইলেন তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিলেন না। সোমবার সমস্ত রাত্র রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন আর জ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক মধ্যে মধ্যে "আহা আহা কি রামরূপ দর্শন করিতেছি, এই কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন। আত্মীয়েরা তাঁহার পীড়ার কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন "কি কষ্ট বেশ আছি।" মঙ্গলবার চিকিৎসকগণ রোগ শান্তির জন্য মদ্য ব্যবস্থা করেন। তিনি আজন্মকাল ঐ দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই, এই হেতু উক্ত দ্রব্য তাঁহাকে সেবন করান হইবে কি না ইহা

তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে আন্দোলন হইতে লাগিল। ইতঃমধ্যে রোগী বিজাতীয় ঔষধ সেবনে নিতান্ত অনিচ্ছা জানাইতে লাগিলেন। তখন সকলেই একবাক্যে তাঁহার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। চিকিৎসা চলিতে থাকিল। রোগী আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকিলেন। মঙ্গলবার দিবা-ভাগ ও রাত্র কাটিয়া গেল। ক্রমে বুধবার আসিল। সেই শ্রাবণের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথি যুক্ত কাল বুধবার আসিল। নবীনচন্দ্র এ পৃথিবীতে শেষ দিন দেখিলেন। সূর্য্যদেব যেমন নিত্য উদয় হন সেইরূপ জগতে দেখা দিলেন। সূর্য্যদেব! জানিনা তুমি কতশত নবীনচন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক পুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়াছ! ক্রমে বেলা ৭টা বাজিল। নবীনচন্দ্র তদীয় মধ্যম পুত্রকে বলিলেন, "আমার নিকট ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায় ও চণ্ডী পাঠ কর"। পাঠ আরম্ভ ও সমাপ্ত হইল; পাঠান্তে তিনি স্বয়ং নবগ্রহস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার নারায়ণ দর্শনের ইচ্ছা বলবতী হওয়াতে গৃহের নারা-

য়ণ মূর্ত্তিটি সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তিনি সম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত। ঐ সময়ে রোগীর হস্তপদাদি শীতল হইয়া পড়িল, কিন্তু রোগী ব্যস্ত নহেন স্থির ভাবে রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। ঔষধের গুণেই হউক আর সময় হয় নাই বলিয়াই হউক হস্তপদাদি পূর্ব্ববৎ সহজ হইল। সন্ধ্যার সময় পুনরায় ঐরূপ। এইপ্রকারে রাত্র নয়টা বাজিল। এই সময়ে রোগী তাঁহার মধ্যম পুত্রকে গঙ্গাজল পানের স্পৃহা জানাইলেন। তিনি আহ্নিক করিয়া যে পঞ্চপাত্রটি গৃহের এক পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন সেই পাত্র হইতে গঙ্গাজল তাঁহার মুখে দেওয়া হইল, তিনি পরম প্রীতি সহকারে পান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার মধ্যম পুত্রকে বলিলেন, "দেখ আমার বামকর্ণে ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম এই কয়েকটী কথা বলিবে"। এই সময় হইতেই সেই অদ্ভুত অভিনয়ের সূত্রপাত হইতে লাগিল। এ জগতে কোন লোক এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছেন কিনা জানিনা। আমি বহুলোকের মুখে মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থার বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, কিন্তু এমন অলৌকিক ঘটনা যে

জগতের কোন প্রান্তে বর্ত্তমান সময়ে ঘটিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ না হইলে বিশ্বাস হয় না। ধার্ম্মিক মানবের আত্মার কি বল। মহাভারতীয় কোন কোন ধার্ম্মিক প্রবরগণের মরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে বটে কিন্তু তাহা বহু প্রাচীন, সে সময়ের সমস্তই অলৌকিক ব্যাপার। ইদানীন্তন শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ, ঈশা, চৈতন্য গোস্বামী প্রভৃতির মরণ বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র প্রকারের। ঈশা ক্রুশ যন্ত্রে দারুণ কষ্ট পাইয়া, "হে পিতা তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলাম" এই শেষ বাক্য বলিয়া রক্তাক্ত কলেবরে দেহ ত্যাগ করেন। শাক্যসিংহ শুক্লপক্ষের গভীর নিশীথে, "ভিক্ষুগণ নির্ব্বাণের জন্য যত্নশাল হইও" এই কথা বলিয়া নীরব হইয়াছিলেন ও তৎপরেই তাঁহার বাকশক্তি রোধ ও চেতনা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু নবীনচন্দ্রের মৃত্যু যে দেখিয়াছে সেই বলিবে যে উহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। উহার বৃত্তান্ত কল্পনা মূলক বা অতিরঞ্জিত নহে। আমাদের দেহস্থিত যে অদ্ভুত পদার্থের শক্তিতে আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ নানাপ্রকার ক্রিয়া করিতেছে, আমরা যাহার বলে কল্পনার উদ্ভব করিতেছি, যে আত্মার

বলে অতীন্দ্রিয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর করিতেছি, যে আত্মার সাধনা বলে যোগীগণ সালোক্য, সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে আত্মার বলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব কখন সন্দিহান হইও না। কখন মনে করিও না এই ক্ষণবিধ্বংসি দেহের পতনে সে আত্মার নাশ আছে। চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে দেহটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, আর আত্মার অসীম ক্ষমতা। এ আত্মার ধ্বংস আছে মনেও স্থান দিওনা। যখন এ দেহ ঐ অদ্ভুত তেজ ধারণে অসমর্থ হইবে, তখন উহা নিশ্চয়ই দেহান্তর অবলম্বন করিবে। আর জানিনা দেবতা-গণ কীদৃশ দেহাবলম্বন করিয়া বিচরণ করেন। যদি আত্মা বিশুদ্ধ হয়, যদি আজীবন ধর্ম্মাচরণ কর, যদি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান হও তবে নিশ্চয়ই জানিবে এই দেহস্থিত আত্মা দেবদেহ ধারণ করিবেই করিবে। আর যদি কদাচরণ কর, যদি পশুবৎ ইন্দ্রিয় সেবন করিতে থাক তাহা হইলে এ মনুষ্য দেহও প্রাপ্ত হইবে না, পশু দেহ বা তদপেক্ষা হীন দেহ অবলম্বন করিতে হইবে।

নবীনচন্দ্রের শ্লেষ্মাঘটিত পীড়া হওয়ায় রোগের

বৃদ্ধি কালীন বাক্যের জড়তা হইয়াছিল। তাঁহার শেষ সময় যত নিকট হইতে লাগিল ততই বাক্য স্পষ্ট হইতে লাগিল। নবীনচন্দ্র আজন্ম উদরাময় রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু রোগ স্বতন্ত্র। পাছে অশুচি হইয়া দেহত্যাগ করিলে, দেহত্যাগ কালীন উৎকট যোগের বিঘ্ন ঘটে সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার উদরাময় ব্যাধি ঘটে নাই। পূর্ব্বদিবস যখন তাঁহার অঙ্গপ্রান্ত সকল শীতল হইয়াছিল তখন তিনি কোন কথা বলেন নাই, কেবলমাত্র নীরবে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতেছিলেন ও জানিনা কি সেই বিচিত্র রামরূপ যাহা দর্শনে তিনি অন্তরে অন্তরে মহা সুখানুভব করিতেছিলেন। এই বুধবার রাত্রি ১০টার পর তাঁহার একবার বমন হইল। বোধ হইল ঔষধ প্রয়োগের সাফল্য হইতেছে। নবীন-চন্দ্রের গলার স্পষ্ট স্বর। তিনি স্পষ্টস্বরে বলি-লেন, "সময় হইয়াছে তোমরা আমায় নামাও"। কোথায় নামান হইবে? সেই কালী দালানে—যে দালান বহু প্রাচীন কালীদেবীর মঠের স্থান অধি-কার করিয়া রাখিয়াছে, যে কালীদালানে চৌষট্টী বৎ-সর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ পার্ব্বতীচরণ সজ্ঞানে দেহত্যাগ

করেন, যে কালী দালানে ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে নবীনের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বিধবা মদনগোপালপ্রাণা—তপস্বিনী বৃদ্ধা রাখালদাসী দেবী একমাত্র সহোদরকে রাখিয়া স্বর্গলাভ করেন—যে কালীদালান স্বপ্নদত্ত হইয়া স্বর্গীয় কাশীনাথ নির্ম্মাণ করেন ও যে কালীদালান পীঠস্থান বিশেষ। নবীনচন্দ্র বড় ব্যস্ত, "তোমরা আমায় কালী দালানে নামাও" নবীন সিংহবিক্রমে আদেশ করিলেন। তাঁহার সন্তানেরা সেই আদেশ প্রতিপালন তৎদণ্ডেই করিবে তাঁহার এই ভরসা। কিন্তু তৎদণ্ডেই আদেশ প্রতিপালিত হইল না। তাঁহার সন্তানেরা ভাবিলেন ঔষধের ফল ক্রমে ক্রমে হইতেছে নতুবা যে ব্যক্তি অস্পষ্ট স্বরে এতাবৎ কথা কহিতে ছিলেন তিনি এত স্পষ্ট কথা কেন কহিতেছেন; স্বরে, বলেরও চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। রোগী অনেক স্বচ্ছন্দ এ সময় দালানে নামানর কথা কেন? কেহই নামাইতে প্রস্তুত নহে। ঘোর তর্ক-বিতর্ক। নবীনচন্দ্র যেন অধীর; যেন উঠিবার বল থাকিলে উঠিয়া কালীদালানে যাইয়া জগন্মাতা কালীদেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহার পদ প্রান্তে শেষ

নিশ্বাস ফেলিবার জন্য কাতর। কিন্তু অতিশয় আপত্তি হইতেছে। এমন সময়ে নবীনচন্দ্র দেখিলেন যে মহা বিপদ, কোন কঠিণ বাক্য প্রয়োগ আবশ্যক নতুবা কার্য্যোদ্ধার হয় না। এই বিবেচনা করিয়া বোধ হয় তিনি পুত্রগণকে বলিলেন "যদি তোমরা আমায় কালীদেবীর নিকট লইয়া না যাও চিরকালের জন্য আমার নিকট ঋণী থাকিবে"। এই কথায় তাঁহার পুত্রগণের চমক ভাঙ্গিল। তখন রাত্রি দ্বি-প্রহর। সকলেই একবাক্যে নবীনকে সেই কালী দালানে নামাইলেন। ব্যস্ত নবীন আশ্বস্ত হইলেন। ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধতার কারণ ঘোর তন্ময়তার পূর্ব্ব চেষ্টা। নবীন চক্ষু ভরিয়া সিন্দূর লেপিত সেই কালীরূপ দর্শন করিলেন। সে সময়ে নবীনচন্দ্র যেন অনেক সুস্থ। সে জোরে নিশ্বাস ফেলা নাই, সে জিহ্বার জড়তা নাই, সে চক্ষের আবল্য নাই। আজন্ম যে দেবীকে অন্তরে মহা-যোগীর ন্যায় সাধনা করিয়াছিলেন, অন্তকালে সেই দেবীকে দর্শন ও তাঁহার রূপ চিন্তা করিয়া নবীনচন্দ্র যেন শান্তি পাইলেন। যে দেবীর আদেশে তিনি আজন্ম পুণ্য কর্ম্মে মন ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন

তিনি যেন অভয়ামূর্ত্তিতে তাঁহার ভক্তকে আশ্বাসিত করিতেছেন ও সেই আশ্বাস বাক্যে নবীন আশ্বাসিত সুতরাং স্থির। ইহা সত্যকথা যে আজন্ম মানব যে চিন্তা করে অন্তকালে তাহার সেই চিন্তা হৃদয়ে প্রবল হয়। এইজন্যই বোধ হয় ঋষিগণের উপদেশ যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কালীন মুহূর্ত্তেক অবসর পাইলেই স্বীয় ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবে। এই গূঢ় ভাব গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকে অন্তর্নিহিত আছে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ ভাব ভাবিতঃ॥

উপরোক্ত ভাবে নবীনচন্দ্রের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। রাত্রি প্রায় একটা, এমন সময় নবীন আবার ব্যস্ত; তিনি তাঁহার মধ্যম পুত্রকে হস্তদ্বারা ঠেলিয়া স্বীয় বামকর্ণের নিকট যাইতে বলিলেন। আজ্ঞা তদ্দণ্ডেই প্রতিপালন করা হইল। নবীন তখন তাহাকে "ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" এই কয়েকটি কথা কর্ণে বলিতে বলিলেন। নবীন স্বয়ং ঐ কথা গুলি বলেন, তাঁহার মধ্যম পুত্রও বলেন, তাঁহার অপর পুত্রেরাও বলেন, স্বজনবর্গ সকলেই ঐ শব্দ

উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য শব্দ ব্রাহ্মণ মুখে উত্থিত হইয়া সেই দালানে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রোগী নবীনচন্দ্র সকলকেই ঐ বাক্যগুলি বলিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে একবার মাত্র বিরতি হইয়াছিল, তাহার কারণ সাধারণে অনুভব করিল যে, যে ব্যক্তি সজোরে এমন কথা কহিতেছেন তাঁহার মৃত্যুর নিশ্চয়ই বিলম্ব আছে। বিরতি হইবামাত্র নবীন ব্যস্ত "থামিলে কেন?" সেই সময় তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণীকে ডাকিলেন। পতিপরায়ণা সাধ্বী নবীন পত্নী সে সময় কালীদেবীর নিকট হত্যা দিয়াছিলেন; তিনি উঠিয়া আসিলেন। নবীন তাঁহাকেও বলিলেন তুমিও সকলের সহিত যোগ দাও। তিনি কাজেই "ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন নবীনচন্দ্র বলিলেন "তুমি স্ত্রীলোক তোমাকে ওঁ উচ্চারণ করিতে নাই, তুমি বল নমঃ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম।" এই কয়েকটী কথার পর নবীনের আর দশ মিনিট কাল দেহে প্রাণ ছিল। তাঁহার স্ত্রী কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিতেছিলেন। তিন মিনিট কাল মুখের দিকে ঐ

বাক্যগুলি বলিতে বলিতে দেখেন যথার্থ স্বামীর শেষ সময় নিকটে। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পদপ্রান্তে যাইয়া বলিলেন "তুমি বল জন্মান্তরে আবার তোমায় পাব," নবীন বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন "আবার কেন?" তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "তবে পাদপদ্ম মাথায় দাও" নবীন দক্ষিণ পদ উত্তোলন করিয়া স্ত্রীর মস্তকে দিলেন। তাঁহার পুত্রেরা এমন মহাপুরুষকে পিতৃত্বে পাইবার বাসনা জানাইলেন। কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়া কেবল ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটিয়া গেল। পুনরায় মহাশব্দে "ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" এই বাক্যগুলি উচ্চারিত হইতে লাগিল। সেই দৃশ্য মৃত্যুকালীন ভয়ানক দৃশ্য নহে, সে এক অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্য তাহা বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত; যেন একটী ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া হইতেছে, চক্ষে সকলেই দেখিতেছে, কাহারও মুখে অপর কথা নাই, কারণ নির্দ্দেশের ক্ষমতা নাই, নিশ্চল, নিষ্পন্দ। আত্মীয় স্ত্রীলোকগণের চক্ষেও অশ্রুধারা নাই, সকলেই নবীনের আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর হইয়া কেবল

মাত্র ওঁ বা নমঃ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বলিতেছেন। ওঁ ওঁ শব্দ অপর, সমস্ত শব্দকে অতিক্রম করিয়া গগন ভেদ করিয়া ফেলিতেছে। ক্রমে নবীনের মুখের শব্দ কমিতে থাকিল। তিনি বাম হস্তে বক্ষের বস্ত্র সরাইয়া দিলেন আর দক্ষিণ হস্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে নবীনের মুখ হইতে একটী একটী শব্দ চ্যুত হইতে লাগিল। ক্রমে "ওঁ গঙ্গানারায়ণ" ক্রমে ওঁ গঙ্গা" অবশেষে "ওঁ ওঁ শব্দ। ক্রমে নবীনের চক্ষু উন্মীলিত, ওষ্ঠ আর নড়ে না, দেহ ছাড়িয়া আত্মা চলিয়া গিয়াছে। আহা কি বলিব তখনও নবীনের মুখ যেন হাসি হাসি, তাঁহার ক্ষীণ তনু এক মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। যে রুদ্রাক্ষের মালা তিনি শেষ দিন আহ্নিক করিয়া শয়নাগারে রাখিয়াছিলেন, আর সেই পট্টবস্ত্রখানি, আর সেই নামাবলী, এই তিন আভরণে সেই মৃতদেহ সজ্জিত হইল। কে বলিবে মৃতদেহ? কে বলিবে দেহে প্রাণ নাই? পাঠক! যোগীর সমাধি কল্পনা চক্ষে দেখিয়াছ? ঈশ্বরে তন্ময়, জড়-যোগী-রূপ-মাধুরী সন্দর্শন হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, চক্ষু

মুদ্রিত করিয়া দশেন্দ্রিয়কে সংযম করিয়া আত্মার অসীম বলে কল্পনা কর, বুঝিতে পারিবে নবীনের পুণ্যাত্মা কেমন দেহ অবলম্বন করিয়া যোগাবলম্বন করিয়াছিলেন। নবীনের জীবিতাবস্থার মূর্ত্তি আর দেহত্যাগ কালীন মূর্ত্তির তুলনা হয় না। ঈশ্বরে তন্ময় যোগী নবীনের মূর্ত্তিতে আর সংসারী নবীনের মূর্ত্তিতে প্রভেদ বিস্তর।

মৃত্যুকালীন নবীনের আন্তরিক বল দেখিয়া আমার নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে যে, যখন তাঁহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া প্রেতরাজ্য হইয়া পলাইতে-ছিল তখনও নবীনচন্দ্র অস্থি মজ্জা রহিত সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বলিতেছিলেন। তাঁহার ঐ শব্দে যমদূতগণ নিশ্চয়ই ভয়ে পলাইয়া-ছিল, আর মহানরকতারিণী পরম ব্রহ্মরূপিণী আনন্দ-ময়ী মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে নবীনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া-ছিলেন। যে সময়ে নবীনের মুখ হইতে ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম শব্দ বহির্গত হইতেছিল তখন তাঁহার আত্মা পার্থিব কোন বিষয়ে আকৃষ্ট ছিল না। দেহত্যাগের সময় তিনি গঙ্গাকে জগন্মাতা ও নারায়ণকে জগৎপিতা জ্ঞানে তাঁহাদের

ভাব গর্ব্ব দর্শন বা চিন্তা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্ব প্রাণ আত্মার সহিত স্তব্ধ হইয়া জগৎ পিতার ও জগন্মাতার ভাবপূর্ণ গুণ-রাশি চিন্তা করিয়াছিলেন। পাঠক! যদি জীবাত্মা কল্পান্তস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস থাকে, বল দেখি নবীনের আত্মা কোথায় স্থান পাইল? গীতার মহাবাক্যে বিশ্বাস হয়? যদি গীতাবাক্যে শ্রদ্ধা থাকে তবে নবীনের মৃত্যুদিনের প্রাতের শ্রুত গীতার অষ্টমাধ্যায়ের—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাং॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাং গতিং॥

এই শ্লোক দুইটি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই নবীনের সূক্ষ্ম শরীর ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য লোক অতিক্রম করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পাঠক! অপেক্ষা কর, একটী পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালকের কথা শ্রবণ কর। নবীনের দেহত্যাগের পূর্ব্বাহ্নে যখন কালোদালানে মহারোলে ওঁ ওঁ শব্দ হইতেছে, নবীনের ভ্রাতুষ্পুত্রের এক

পুত্র দ্রুতগতিতে ঐ স্থানে যাইতেছিল এমন সময় দেখে যে বাটীর দ্বারদেশে দুই অদ্ভুত মূর্ত্তি, জটা-ধারী, আরক্তিম লোচন, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র ও হস্তে লৌহদণ্ড ; দুইজনেই দ্রুতবেগে দালানের দিকে যাইতেছেন। তাঁহাদের পা মৃত্তিকায় ঠেকিতেছে না, তাঁহারা নবীনের মস্তকের নিকট দাঁড়াইলেন ও ক্ষণকালমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। পাঠক! বালক অলীক বাক্য বলে নাই। মহাপুরুষের সূক্ষ্ম শরীরকে পরপারে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-কারী মহেশ প্রসন্ন হইয়া কাণ্ডারী পাঠাইয়াছিলেন।

নবীনের শব সমারোহে গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনার সঙ্গমস্থল সেই পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তথায় নিম্নলিখিত যে কয়েকটি বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার কোন গূঢ় অর্থ আছে কি না, পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। (১) ত্রিবেণীর শ্মশানে নিত্য বহু শবদাহ হইয়া থাকে। নবীনের শব বেলা ১১টার সময় শ্মশানক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছিল, আর দাহাদি কার্য্য সমাধা করিতে বেলা পাঁচটা হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে দিবস অপর কোন শব ঐ স্থানে যায় নাই।

নবীনের শবদাহাদি কার্য্য সমাপ্ত হওয়ার অব্য-
বহিত পরেই অনেকগুলি মৃতদেহ আসিয়া পৌঁছিয়া
ছিল। (২) আচার বিহিত শব স্নানের সময়ে মুহূর্ত্ত-
কালের জন্য বৃষ্টি হইয়া শব স্নান হইয়াছিল। (৩)
আর শবদাহান্তে গঙ্গার অপর পারে, রামধনুর উদয়
হয়। এমন রামধনুর শোভা নভোমণ্ডলে সচরা-
চর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার সহিত নবীনের
রামরূপ দর্শনের কি কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে?
যিনি চক্ষুর, বাক্যের ও মনের গম্য নহেন, তিনিই
বলিতে পারেন। শ্মশান কি অদ্ভুত স্থান! এই
স্থানই বুঝি বৈরাগ্যের আকর ভূমি। হায়! কোথায়
নবীনের সেই পট্টবস্ত্র, কোথায় সেই নামাবলী,
কোথায় সে প্রিয় রুদ্রাক্ষের মালা, আর কোথায়
সে নবীন! এই পবিত্র স্থানে যে একবার পদার্পণ
করিয়াছে সেই বুঝিয়াছে যে এ জগতের সকলই
মিথ্যা, ধর্ম্মই সত্য; আর কিছুই কিছু নহে। তাই
বুঝি যমরাজ ধর্ম্মরাজ? ধর্ম্মরাজ! তোমায় নমস্কার
করি। তুমিই সত্য। হুতাশন! তুমি সর্ব্বভুক্‌।
তুমি চিরদিনই কোটী কোটী মানব, পশু, কীট, পত-
ঙ্গকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে উদরস্থ করিতেছ সত্য। কিন্তু

বাহ্যজগতের যাহা কিছু তাহারই উপর তোমার অধিকার তুমি অন্তর্জগতের কিছুই ভক্ষণ করিতে পার না। তুমি ধাম্মিক নবীনের কি করিতে পারিলে? ধর্ম্মজীবনের নিকট আগমন তোমার সাধ্য নহে।

পাঠক! এ বৃত্তান্তের একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। আমি কাব্য লিখিতে বসি নাই, উপন্যাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার এই বৃত্তান্ত লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হিন্দু ভারত সন্তান ইহা পাঠ করিয়া শিক্ষা পাইবেন। স্বধর্ম্মে থাকিয়া লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া ও সত্য প্রতিপালন করিয়া গৃহস্থ জীবনে, ইংরাজী শিক্ষা করিয়াও কি প্রকারে ধর্ম্মের সেবা যে এই বিংশ শতাব্দিতেও সম্ভবে আর ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির যে উত্তম গতি নিশ্চয় তাহাই দেখান আমার অভিপ্রায়। নবীনচন্দ্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ইহার একবর্ণও লেখা হইল না। তবে একটা কথা বলি—ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ; বাহিরের নয়। এই ধর্ম্মজীবনের কাহিনী পড়িয়া যদি একজনেরও সুমতি হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

সমাপ্তঃ।
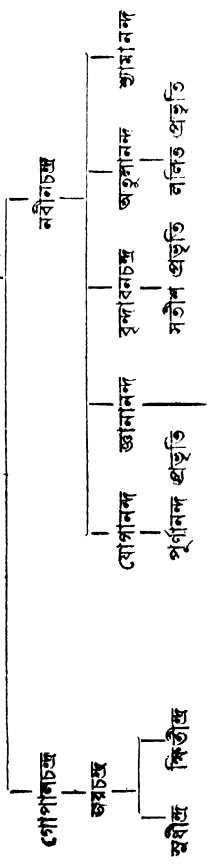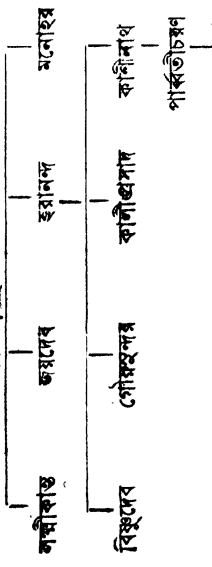
নারায়ণ (দক্ষ হইতে ১৮ পুরুষ অধস্তন)
লক্ষ্মীকান্ত
জয়দেব
হরানন্দ
মনোহর
বিষ্ণুদেব
গৌরসুন্দর
কালীপ্রসাদ
কাশীনাথ
পার্ব্বতীচরণ
গোপালচন্দ্র
নবীনচন্দ্র
জয়চন্দ্র
সুধীন্দ্র
ক্ষিতীন্দ্র
যোগানন্দ
জ্ঞানানন্দ
বৃন্দাবনচন্দ্র
অতুলানন্দ
শ্যামানন্দ
পূর্ণানন্দ প্রভৃতি
সতীশ প্রভৃতি
ললিত প্রভৃতি
কালীকিঙ্কর
কৃষ্ণকিঙ্কর
পঞ্চাননকিঙ্কর
কমলাকিঙ্কর
রাধাকিঙ্কর
নারায়ণকিঙ্কর

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আত্মগৌরব বৃদ্ধি ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহা পাঠে এই সামান্য পুস্তকখানিতে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিলে আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইতি—

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী।

NARIKELDANGA.
11*th November*, 1901.

My dear Jnan Babu,

I have read with great pleasure your excellent little book "Dharma Jiban" in which you have given a brief but interesting sketch of the life of your late lamented father. To say nothing of the many other good qualities that adorned him, his was a life of exemplary piety and rigid self-denial, which others would do well to imitate.

The book is written in a simple and elegant style, quite in keeping with the charming simplicity of the life it delineates.

May you as a worthy son of a worthy father, live long and prosperously to preserve his good name.

Yours affectionately,
(Sd.) GOOROO DASS BANERJEE.

ধর্ম্ম-জীবন নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের কিয়দংশ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলাম। পুস্তকখানি আয়তনে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অর্থ গৌরবে ক্ষুদ্র নহে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা অতি বৃহৎ পুস্তক। ধর্ম্মের যথাযথ আচরণ করিতে পারিলে বর্ত্তমান সময়েও যে তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, পুস্তকোল্লিখিত আশ্চর্য্য ঘটনা তাহার প্রমাণ। ইহা একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী হইলেও ধার্ম্মিক মহাশয়গণ ইহাতে ধর্ম্মের আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিবেন এবং উপদেশও পাইবেন।

ইহার ভাষা কোমল ও মার্জ্জিত। রচনা প্রণালী হৃদয়াকর্ষক।

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ সাল, (স্বাক্ষর) শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা

কলিকাতা। (মহামহোপাধ্যায়)

—০—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন— কলিকাতা

মহাশয়। ৫।৪।১৪

আমি আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনী ধর্ম্ম-জীবন নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশিষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থের ভাষা সরল ও উহার সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। আপনি যে জীবন-কথা গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, আজকালকার দিনে ঐরূপ স্বধর্ম্ম বিশ্বাসী, আচারবান ও সংযম পরায়ণ ব্রাহ্মণের আদর্শ জীবন একান্ত বিরল। ঐরূপ জীবনের বর্ণনায় লিপি চাতুর্য্য অপেক্ষা সত্য ও সরলতার অধিকতর প্রয়োজন। আপনার রচনায় এই দুই গুণই বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। জীবনী গ্রন্থে

প্রায়ই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যার সমাবেশ অপরিহার্য্য। যত-দূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে আপনার গ্রন্থে তাদৃশ সমাবেশ দেখিলাম না। আশা করি, আদর্শ ব্রাহ্মণের আদর্শ জীবনী পাঠ করিয়া প্রকৃত হিন্দু পাঠকমাত্রেই স্বধর্ম্মে অধিকতর আস্থাবান হইবেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী

(এম, এ; রায় বাহাদুর)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয়

আপনার "ধর্ম্ম-জীবন" বাল্য পাঠ্য নহে। পুস্তকের বহুল প্রচার দ্বারা অর্থার্জ্জন আপনার উদ্দেশ্য নহে। অতএব আপনার পুস্তক সম্বন্ধে আমার অকিঞ্চিৎকর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। আপনি রচনার লালিত্য বা ভাবের ঔদার্য্য সম্বন্ধে প্রশংসার বিশেষ আশা রাখেন না। পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিরক্ষা ও তৎপ্রসঙ্গে আদর্শ হিন্দু জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ আপনার উদ্দেশ্য। এই উভয় উদ্দেশ্যই সুসাধিত হইয়াছে।

আমার ন্যায় যাঁহারা বৃপহারায় আছেন, পুরাতনের প্রতি অনুরক্ত অথচ নূতনের সহিত বৃর্ণিত, তাঁহাদের নিকট গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইবে। গ্রন্থখানিতে আপনার প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাই। বিনয়, আস্তিক্য, বৃদ্ধভক্তি, চিরন্তনবর্ত্মানুসারিতা অথচ প্রকট দোষের স্পষ্ট স্বীকার ও সংস্কার চেষ্টা সর্ব্বত্র বিরাজমান। আপনি যেমন এই গ্রন্থে পূর্ব্বতনদিগের স্মৃতিরক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ এই গ্রন্থ আপনারও স্মৃতিরক্ষা করিবে। ইতি ১২ই বৈশাখ, সন ১৩২০ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য

(এম, এ, বি, এল)